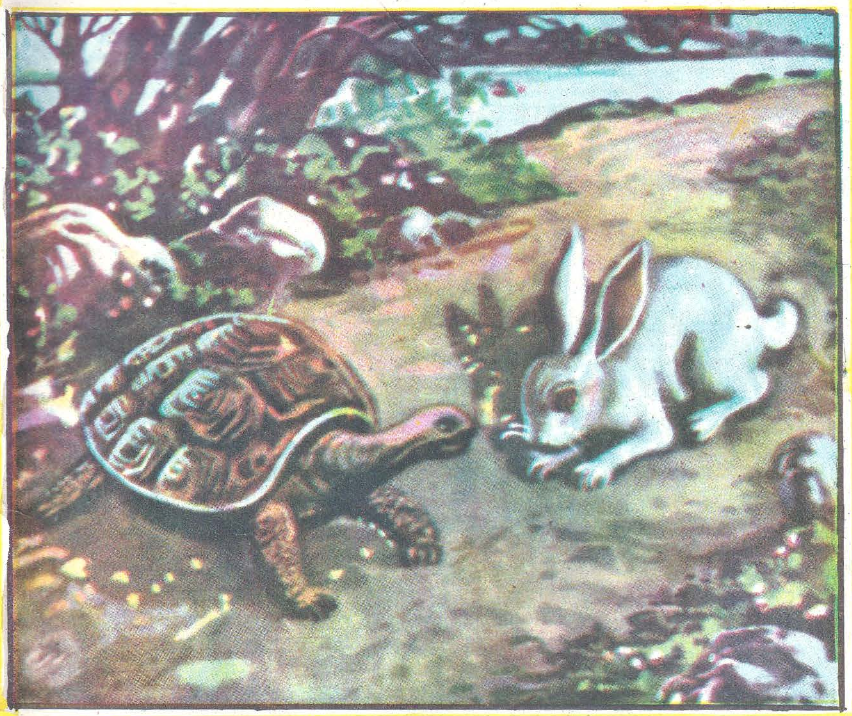
ছোটদের আসর

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০

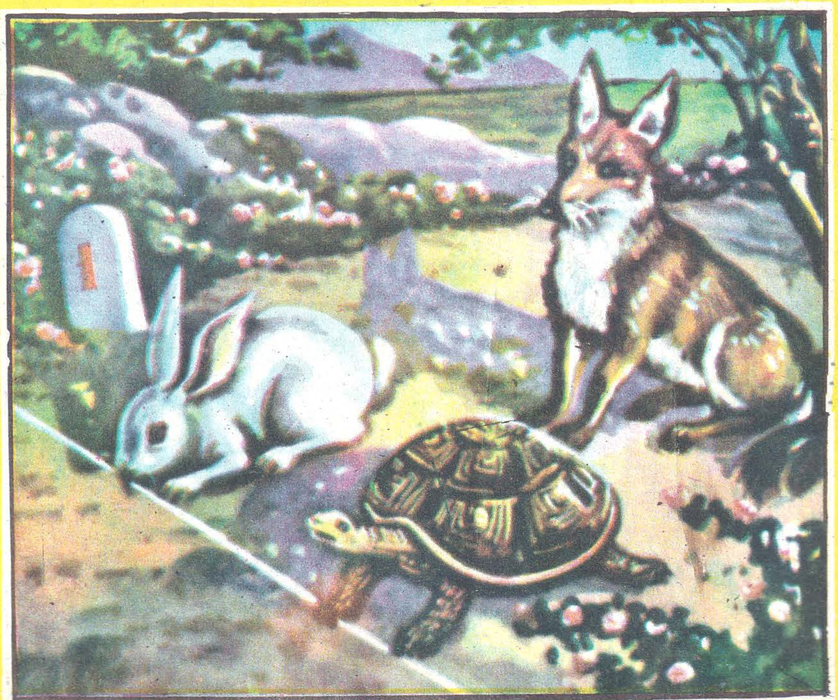


বড় কে ?

দু' বন্ধু। খরগোশ আর কচ্ছপ, খরগোশের মনে খুব অহংকার। সে কচ্ছপের চাইতে দেখতে সুন্দর এবং দ্রুতগামী। কথায় কথায় বলত—তোর বেঢপ শরীর··· হাঁটতে চলতে দিন যায়। আর আমি ···এক সেকেণ্ডে বিদ্যুতের মত কোথায় চলে যাই।

কচ্ছপ বলল—ঠিক্ আছে একদিন দুজনে রেস হয়ে যাক্। জঙ্গলের একপ্রান্ত থেকে নদীর ও প্রান্তে যে আগে পৌঁছাবে সেই সেরা।

খরগোশ সংগে সংগে রাজী ? খরগোশ ও কচ্ছপের তৃতীয় বন্ধু শেয়াল হল সাক্ষী। সে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে দু-জনকে দৌড়াবার নির্দেশ দিল।





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ স্বাগত ওয়াকার

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জী

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

১। ১ বৎসরের গ্রাহক চাঁদা ২৪.০০ টাকা। ৬ মাসের জন্য গ্রাহক হতে হলে দিতে হবে ১২.০০ টাকা। ৬ মাসের কম গ্রাহক করা হয়না।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২.০০ টাকা। গ্রাহকরা সেই দামেই বই পাবে। ডাকে বই পাঠানোর জন্য কোনো বাড়্তি খরচ গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া হয় না।

৩। গ্রাহক হতে হলে পুরো টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

৪। গ্রাহক চাঁদা এম-ও অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে Print and Publication Sales Concern-এর নামে পাঠাবে।

এজেন্ট হবার নিয়মাবলী

প্রতি এজেন্টকে কম করেও ৫টি কপি বই নিতে হবে।

২। প্রতি কপির ডিপোজিট মূল্য ২.০০ টাকা জমা রাখতে হবে।

৩। ১০—২৫০ কপির জন্য—২৫% কমিশন দেওয়া হয়।

২৫০—১০০০ কপির জন্য—৩০% ,,

১০০০ এর ওপর বই নিলে—৩৩$\frac{1}{3}$%

৪। টাকা এম-ও অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে "Print and Publication Sales Concern এর নাম পাঠাতে হবে।

প্রতি ইংরেজী মাসের ৭ তারিখে ছোটদের আসর প্রকাশিত হয়।


ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
কিছুক্ষণের জন্যে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, খাঁদু। কিন্তু আমি চাই যে আমি যাবার পর তুই গাড়িটাকে পালিশ করবি।
ওরে বাবা! বড্ড শক্ত কাজ!
কিছুদিন আগে দাদু সহজে পালিশ করবার জন্যে একটা স্প্রে তৈরি করেছিলেন। মনে হচ্ছে এটাই সেইটা!
অ্যাই মরেচে! আমি ভুল করে চুল গজাবার স্প্রে লাগিয়ে ফেলেছি!
এটা সেই জিনিস যেটা দাদু টেকোদের সাহায্যের জন্যে তৈরি করেছিলেন। আমি এটা দিয়ে বেশ মজা করতে পারি!
এই যে, ফাটকা! চুলওয়ালা ট্রাইসাইকেল দেখতে কেমন লাগে দেখি তো!
অ্যাই! তুই আমার গাড়িতে কি করছিস খাঁদা?
ওও! ইরক! হোঃ হোঃ! ভয়ানক সুড়সুড়ি লাগছে মাইরি! হিঃ হিঃ!
হিঃ হিঃ! ...গেছি রে!
হিঃ হিঃ! দারুণ মজা হলো!
এবার দেখি পিছলে নামার এটাতে এই স্প্রে করলে কি ফল হয়।


অ্যাই! এই পিছলে নামার জিনিসটা চুল দিয়ে জ্যাম করে আমাদের খেলার মজাটাই ভেস্তে দিলি, খাঁদা!
স্নুপস! আমি আমার জম্যানো সমস্ত পয়সা দিয়ে এই দই কিনেছি এবার আয়েশ করে খাবো!
তাই ভেবেছিস বুঝি?
ইয়ক! আমার দইয়ের হাঁড়ির দাড়ি গজালো কি করে?
ইয়ারগাহ্! আমার দৈ খাওয়া তুই পণ্ড করেছিস, খাঁদা! তোর গণ্ড আমি খুবলে দেবো!
এখানে থাকা আর সমীচিন নয়!
কি ব্যাপার? খাঁদা কি আবার কোন গোলমাল পাকিয়েছে? তাহলে আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেবো!
যদি আমাকে ধরতে প্যারো!
আমার পিছনে দাদুর ধাওয়া করাটা আমি আটকানোর ব্যবস্থা করি!
হিসস!
আরে! আমি দরজা খোলার হ্যাণ্ডেল খুঁজে পাচ্ছি না!
হিঃ হিঃ! দাদুকে হাঁদু বানিয়ে আমি নিজেকে খাবার ঘরে বন্ধ রেখেছি। চাকুম-চুকুম!
দুম! দুম!



॥ সম্পাদকীয় ॥

সূচীপত্র

সম্পাদক—শ্রীদেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনায় ও শিল্প নির্দেশনায়—বেবী মজুমদার, শুভ্রা রায়

প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন সেলস কনসার্ন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক দীপ্তি প্রিন্টিং ১৩ এম, আমির্ক রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৬৭ হইতে মুদ্রিত।

ছোট্ট বন্ধুরা,

কি খুব মজা করে আম, জাম, লিচু খাওয়া হচ্ছে তো? দ্যাখো গ্রীষ্মের লম্বা ছুটীটা এসে গেল। একদিকে বাংলার জ্যৈষ্ঠ, বছরের দ্বিতীয় মাস, অন্যদিকে ইংরাজী বছরের মাঝামাঝি।

ছুটী কিন্তু দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। পড়া চলছে কেমন! ষাণ্মাসিক পরীক্ষা স্কুল খুললেই শুরু পড়ার সময় পাবে না। ছুটীর মধ্যে খেলা, বেড়ানো, আম, জাম, লিচু সব চলুক। সেই সঙ্গে পড়াগুলো ঝরঝরে মুখস্থ করো আর লিখে যাও। গরম? তাতো একটু হবেই ভাই। এ যে প্রকৃতির ধর্ম।

তবে গরমটা ফুরুলেই যে ঠাণ্ডাটা হবে তা তোমাদের উপভোগ্য হবে কি বল?

তোমাদের কাছে আর একটা প্রস্তাব রাখছি। কোন ভাল জিনিষ করতে গেলেই অনেকের ভাব ভাবনার প্রয়োজন হয়। তোমাদের কাছে আমার প্রস্তাব এই ভাব-ভাবনার তোমরাও অংশীদার হও। ছোটদের আসর আরো সুন্দর করে সাজানোর জন্য তোমাদের ভাবনাও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হোক। তোমাদের গুরুজন যাঁরা আমাদের দেশের ছেলে-দের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছেন তাঁদের সুচিন্তিত মতামত নিয়ে আমাদের চিঠি দিয়ে জানাবে। নিশ্চয়ই যেন এই ভাবধারা এবং সুচিন্তিত ভাবনা আমাদের এই পত্রিকার এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করবে। আশা করবো তোমরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

আমার প্রস্তাব ভুল না যেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। ইতি—

শ্রীদেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়



"আমার ছেলেবেলা"–
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অনুলেখক বিপ্লব দাশগুপ্ত



ছোটবেলার গল্প বলতে হলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। বাড়ীতে ভীষণ কড়াকড়ি ছিল। খেলাধুলায় বাঁধা ছিল না ঠিকই কিন্তু রুটীন মেপে চলতে হত। সকালে পড়া, দুপুরে স্কুল, বিকেলে খেলা, রাতে পড়া —এই ছিল দৈনন্দিন রুটীন। সন্ধ্যের আগে বাড়ী না ফিরলে দাদা শাস্তি দিতেন।

বেলঘরিয়াতে থেকেও আশপাশ অঞ্চল সম্বন্ধে কোন ধারনা ছিল না। তবে বছরে তিনদিন অর্থাৎ দুর্গাপুজোর সময় বাবা আমাদের নিয়ে ঠাকুর দেখাতে বেরোতেন। আমাদের দৌড় ছিল দমদম বিমান বন্দর থেকে বরানগর অশোকগড় পর্যন্ত— সব কটা প্রতিমা দেখিয়ে আনতেন।

এবার লেখার কথাতেই আসছি। আমার ছোট বেলার কথা জানতে সবাই আমার ফুটবলার জীবনের খোঁজই করবে।

ছোটবেলায় বেলঘরিয়াতে নয়াপল্লী মাঠে খেলতে খেলতে আমাদের আণ্ডার হাইটে সাত জনের একটা ভাল দল তৈরী হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার হয়ে এখানে ওখানে ভাল খেলতেই পুবপাড়া ক্লাব থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুবপাড়া সাংস্কৃতিক সংগঠনের আণ্ডার হাইটে তখন দারুন টীম ছিল। ঐ ক্লাবের নিরঞ্জন সরকার আমাদের অনেক টুর্ণামেন্টে খেলিয়েছেন। ওদের হয়ে বেশ কটা ট্রফি জিতেছি। ওখানে বছর দুই থাকার পর চলে এলাম বেলঘরিয়া অ্যাথেলেটিক ক্লাবে। বেলঘরিয়ার প্রদীপ রায় চৌধুরী এবং কলকাতার মণিংস্টারের মতিয়ার রহমান তখন মিলেমিশে একটা দারুন আণ্ডার হাইট টীম করতেন। ঐ টীমকে বাংলাদেশের কেউ তখন হারাতে পারত না। আণ্ডারহাইটে প্রথমে আমি ডিফেন্সে খেলতাম। মাঝে মধ্যে অবশ্য গোলেও খেলেছি। তবে শেষের দিকে ছিলাম পুরদস্তুর ফরোয়ার্ড। সেই সময় প্রচুর গোল করেছি। রাজারহাটে চলতি বলে একটা গোল করেছিলাম যা থেকে নেট ছিঁড়ে গিয়েছিল। শুনলে অবাক হবে সেই গোলটি করে ছিলাম যার বিপক্ষে তিনি হলেন আজকের ভাস্কর গাঙ্গুলী। ভাস্করের বিপক্ষে তখন প্রায়ই খেলা হত প্রায়ই গোল করতাম। একটুও বেশী বলছিনা ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

এভাবে খেলার পর বাবা-দাদা বললেন হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আর বেশী ফুটবল নিয়ে মাতামাতি চলবেনা। তাছাড়া ১৯৭১ সালে আমার উচ্চতা আণ্ডার হাইটে খেলার সীমা ছাড়িয়ে যায়। যার জন্য আণ্ডার হাইটে খেলা হত না তেমনি বড়দের দলে খেলার মত সুযোগও ছিল না। সেই কারনে ১৯৭১ সাল শুধু মাত্র স্কুল ফুটবল খেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে এরই ফাঁকে ১৯৭৩ সালে আন্তঃ জেলা জুনিয়র ফুটবলে ২৪ পরগনার হয়ে সুযোগ পেলাম। কিন্তু প্রথম এগার জনের মধ্যে ঢুকতে পারি নি। তাই মনে ব্যথা ছিল।

১৯৭৪ সালে প্রথম কলকাতায় খেলার সুযোগ পেলাম। সুযোগ করে দিলেন সোদপুর ক্লাবের নবীন ঘোষ। তিনি নিজে থেকেই আমার খোঁজ খবর নিয়ে বাড়ীতে এসে ডেকে নিয়ে গেছিলেন। জীবনে কলকাতা মাঠে প্রথম ম্যাচ খেললাম মোহনবাগানের বিপক্ষে। সে বছর আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় দলে কলকাতা দলে নিজের জায়গা করে নিয়ে ছিলাম। কলকাতাতে পুলিশ টীমে পরের বার নিয়মিত ভাবে খেলতে লাগলাম। জুনিয়র ন্যাশনালে সুযোগ পেলাম। সেইসূত্রে ভারতীয় ফুটবল। তার পরের ঘটনা সবই তোমরা জান।

সেরা সওয়ার

শুভ্রা রায়

গোপালপুরের মস্ত জমিদার চাঁদ বদন খাঁ। তার তিন ছেলে। অম্বু, কম্বু আর গম্বু।

বেচারা দিন-রাত্তির খেটে চলেছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে তিন ভায়ে মিলে মিশে কাজ করে। অম্বু কাটে মাটি, কম্বু ছড়ায় বীজ আর গম্বু জমিতে দেয় জল।

এভাবে চাঁদবদন ছেলেদের খাটুনির ফসল বিক্রি করে দিন দিন ধনী হচ্ছে।

বড় আর মেজ দুজনে দুই রূপবতী রাজকন্যাকে ইতিমধ্যে পছন্দ করেছে। কিন্তু বাবা তাদের বিয়ে দিচ্ছে না। তাই দুজনেরই খুব মন খারাপ।

ওদের দেশের নিয়মটা একটু আলাদা। ছেলেদের বিয়ের কথা তুললেই জমিদার মশাই রেগে কাঁই।

মশাই বলেন কি। বিয়ে দিলেই ওরা কুঁড়ে বনে যাবে। তাছাড়া জানেন তো কন্যা পণ দিতে হবে দশ হাজার মোহর, বিশ ভরি গয়না আর এক বিঘে জমি। দু ছেলের জন্য কত খরচ হবে ভেবে দেখছেন।

লোকের মুখে বাবার এই ধরণের উক্তি যত শোনে ততই মুষড়ে পড়ে। কারণ বিয়ে না হলে ওদের দেশের ছেলেরা ইচ্ছে মত কোনো কাজ করার সুযোগ পায় না।

কি করা যায়।

বড় আর মেজ একদিন ছোটকে ধরল।

— দেখ্ গম্বু, তুই সবার ছোট বলে বাবা তোকে খুব বেশী স্নেহ করেন। যা না, বাবাকে গিয়ে বল আমাদের বিয়েটা যদি তাড়াতাড়ি...

ছোট অম্বু। লিলিপুটের মতই ছোট বটে। বড় দু দাদার হাঁটুর বয়সী সে। এখনও কাজ থেকে ফিরে এলে চাঁদবদন ওকে কোলে নিয়ে গালে টুসকী টোকা মারে।

সে বললে জমিদার বাবা কি কথার কোনো মূল্য দেবেন। তবু সে এগোয়, পা টিপে টিপে।

জমিদার তখন বসেছিল পেল্লাই উঠোনে। খালি গা। মোষের মত মিশমিশে কালো রঙ। তাতে ঠেসে তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল চারজন চাকর। তাদের মধ্যে একজন আবার কেবল পাকানো গোঁফখানার পরিচর্যায় ব্যস্ত।

গম্বু খুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানে।

—বাবা একটা অনুরোধ ছিল।

—কার তরফে বাছাধন। তোমার নিজের জন্য না পড়শীদের ?



—আজ্ঞে আমার জন্য তো নয়ই, নয় পড়শী-দেরও।

— তবে ?

— আজ্ঞে অনুরোধ হল গিয়ে দাদাদের তরফে।

— তা বল শুনি —

— বলছিলুম কি বড়দা-মেজদার বিয়ের ভোজ খেতে বড্ড ইচ্ছে করছে, কবে খাবো ?

— ওহো! বিয়ের ভোজ! বেশ তো খাবে। তবে দাদাদের বোলো যা প্রচণ্ড শীত পড়ছে দেখছ তো। এরমধ্যে মাঠের বরফ সরাতেই তোমার দাদারা কুপোকাত্, সকাল সন্ধ্যে গড়িয়ে যাচ্ছে।

অন্তত পক্ষে আমার ঘোড়াগুলোকে একটু চাঙা হবার সময় দাও। এত শীতে ওরা কনে আনতে যেতেই পারবে না।

শীত গিয়ে বসন্ত আসুক। সোনালী ধান ঘরে তুলে রোদ ঝলমল ঘাসের পথ ধরে তোমার দাদারা যাবে বিয়ে করতে, কেমন ?

আর বুঝতেই পারছ, দু-দাদার বিয়ের মস্ত ভোজে তুমিই হবে একচ্ছত্র সম্রাট।

জিভে চুক্ চুক্ করে লাল-ঝোল টেনে গম্বুবাবু খবর দিল দাদাদের।

ক্রমশঃ তুষারপাত শেষ হল। বরফ গলে গলে জল। জল আঁক-বাঁক পেরিয়ে যায়। পড়ে নদীতে। আকাশের মেঘরাও একদিন হারিয়ে যায়। চোখে এসে লাগে ঝলক ঝলক রোদ্দুর।

রোদ্দুরের তেজ বাড়তে বাড়তে এলো গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। ফের শীত। কিন্তু খাঁ তার দেয়া কথা রাখে না।

ছেলেরা বলল, না এভাবে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে আর ভাল লাগছে না। কিছু একটা অঘটন ঘটা উচিত।...

প্রকৃতির দেবতা বোধহয় খাঁ ভাইদের ওপর সদয় ছিলেন। সেদিন বিকেলে হঠাৎ ঝড় উঠল। ভয়ংকর ঝড়ের গতি। সেই সঙ্গে তুষারপাত।

পলকের মধ্যে জমিদারের ক্ষেত-খামারের ওপর গড়িয়ে উঠল বিশাল বিশাল স্তূপ পর্বত। জমিদার বাড়ীর ছাদের ওপর জমাট তুষার দেখে মনে হল এক নতুন পিরামিড।

ঘোড়াশালে কিচির মিচির শব্দ। শুনে জমিদার আর তার গিন্নি ছুটে গেল।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। সাড়ে নিরানব্বইটা ঘোড়া। মানে নব্বইটা বড় এবং তাদের এক ছানা। তার মধ্যে দেখতে দেখতে নিরানব্বইটা প্রাণীই ভোঁচ্ ভাঁচ্ করে — তুষার গিলতে গিলতে মরে গেল।

তুষারে মাথা মুখ ঢেকে যাওয়ায় মরে গেল খাঁ এবং গিন্নি।

আর ছানা ঘোড়াটা বডড স্মার্ট। গোটা কয়েক ইয়া বড় লাফ মেরে ঢুকে পড়ে জমিদারের খাস মহলে।

খাস মহলে ঘেরা ঘরে ছিল তিন ছেলে। ওদের মাঝখানে হাজির ছানা ঘোড়া। ওরা ছানা ঘোড়াকে নিয়ে আদর করতে শুরু করে দেয়, কিন্তু চুপচাপ কাঁদতে থাকে।

অম্বু, কম্বু কিছু বুঝে উঠতে পারে না। এ-ওর দিকে তাকায়। আঙুল দাঁতে কামড়ে গম্বু ওঠে লাফিয়ে, 'কেল্লা মার দিয়া।'

সে ঘোড়াশালার দিককার খুপড়িতে চোখ রাখে। দেখে সেখানে ঘোড়াদের চিহ্নমাত্র নেই। রয়েছে পাহাড়।

বুঝলে গো দাদারা, তোমাদের ভাগ্য এবার খুললেও খুলতে পারে। বাবা, মা দুজনেই তুষারের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

উ-হুঁ—হুঁ। ই-হিঁহিঁ।

তিন ভাই মিলে সুর করে গলা ছেড়ে কাঁদল।

তারপর ঝড় থামতেই ওরা বেরুল তুষারে সমাধিস্থ পিতামাতার সৎকার করতে।

খাঁ পরলোকে যাওয়ায় বিয়ের সুযোগ এলেও দুর্যোগ এসে সব নির্মূল করে দেয়। কারণ তাদের সব সম্পত্তিতো ঝড়ে নষ্টই হয়ে গেছে। ঘরে খাবার জন্য যা সঞ্চিত ছিল সেসবও শেষ।

সারাদিন বন-জঙ্গলে ঘুরে তারা ফলমূল যোগাড় করে খায়। সুতরাং রূপবতী রাজকন্যাদের কথা তারা ভুলতে থাকে।

গম্বু একটু বড় হয়ে গেছে। সে সেই ছোট্ট ঘোড়ার ছানাকে আদর করে—ঘাস খাইয়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় আর রোজগারের ধান্দায় থাকে।

এর মধ্যে পাশের গাঁয়ে ঘোড়াদের দৌড় প্রতিযোগিতার আসর বসে। খবর পেয়ে গম্বুবাবুও ছোটে।

লিলিপুটের মত ঐ চেহারাকে কেইবা পাত্তা দেয় বলো। না দিক। গম্বুর তাতে কিছু ক্ষতি নেই।

ঘোড় দৌড়ের আয়োজন হচ্ছে দেয়ানজী আলম–গীরের তালুকের অধীন এক ময়দানে।

প্রতি বছর দেশ বিদেশের বহু সওয়ার যোগ দিতে আসে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। যোগদান করে আলমগীরের পোষা দশ সওয়ার। তারা চৌকশ। কেউ তাদের হারাতে পারে না।

বিদেশীরা না জিতলেও ঐ দশজনের একজনই হয় সেরা। বহুদিন ধরে এমনিভাবে চলছিল প্রতিযোগিতা। তাই দৌড়বাজদের কাছে এই রেসে যোগ দিতে আসার ঝোঁক কখনো কমেনি।

এবারো সবাই হাজির। রেসের জন্য প্রস্তুত

গম্বু। আঁকা বাঁকা চড়াই উৎড়াই পথ পেরিয়ে পৌঁছতে হবে বিজয়ীর তাঁবুতে।

পুরস্কার ?

সেসব বলছি পরে, আগে দৌড় শুরু হোক।

দৌড় দৌড় দৌড়। ছুটছে সব ঘোড়া। গম্বুও লাগাম ধরেছে কষে, কিন্তু মহামুশকিলে পরা গেল। ঘোড়া যে ছোটে না। কচি তো, তাই বুঝি ভয় পেয়েছে না কি।

বুকটা কেঁপে উঠলো। তবু ঝাঁপিয়ে পড়ল তার চাবুক। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ঘোড়া। তার পরেই তড়িৎ গতিতে ছোটে।

—উঃ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন। গম্বুর ইচ্ছে করে একপলকে দেখে নেয় ঘোড়ার পিঠে এক জোড়া পাখা গজিয়েছে কিনা। কিন্তু সেই ফুরসৎই বা কোথায় ?

মুহূর্তে কি দুরন্ত হয়ে গেছে ঘোড়াটা। ভাবা যায় না, একেক করে পিছনে ফেলে দেয়—নিরানব্বই অশ্বারোহীকে।

আমাদের পুচকে সওয়ারও বেশ বুদ্ধি রাখে। পাশ কাটিয়ে আসার সময় নিরানব্বই জন সওয়ারের টুপি সে সংগ্রহ করে ভরেছে এক থলিতে।

বাকী ছিল তিন। এক নিমিষে ওদের তিনজনের টুপীও গম্বুর ঝোলায় চলে গেছে। তীরের মত ঘোড়া ছুটে ঢুকে পড়ল বিজয়ীর তাঁবুর ভেতর।

পুরো ব্যাপারটা যেন ছু-মন্তরে ঘটে গেল। আলমগীরের পাহারাদার আর আলমগীর নিজেও অবাক। ছোঁড়াটা বোধহয় মাঝ পথ থেকে ঢুকে পড়েছে।

ওরা এসব মিথ্যে কথা ভাবছে। ঠিক এই সময় গম্বু আর তার ঘোড়া দুলকি চালে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

যাদুকরের মত ঝোলা উপুর করে দেখিয়ে দিল পরাজিত সওয়ারীদের টুপীগুলো।

আলমগীর সাহেব এবার পুরস্কারগুলো যদি দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন—

দেব তো বটেই। অন্য প্রতিযোগীরা এসে পৌঁছুক।



—আপনার দেখছি কোনো আন্দাজ নেই। তারা আসবে তিন রাত্তির পার করে। আমি ওদের জন্য শুধু শুধু বসে থাকতে পারি। আমার তো নাওয়া খাওয়া আছে।

এতক্ষণে আলমগীরের হুঁশ হল।

—তাতো ঠিকই বলেছ। ওরা রয়েছে ঘোড়ার পিঠে আর তুমি হলে গিয়ে বিজয় মঞ্চে। এই নাও বিশ লক্ষ মোহর। এটা তোমার দৌড়বাজীর পুরস্কার। আর সেরা দৌড়বাজ হয়েছ বলে তোমার সাথে বিয়ে দেব আমার রূপবতী কন্যার। আজ ফিরে যাও তোমার গ্রামে।

সব সওয়ারীরা যেদিন পৌঁছবে সেদিন বসবে বিয়ের আসর। সকাল সকাল চলে এসো কিন্তু। আর শোনো বিয়ের সব খরচ কিন্তু আমারি।

পুচকে গম্বু বাজী জিতে যেন মস্ত বড় হয়ে গেছে। আনন্দে ডগমগ। তার ঘোড়াকে আদর করে পিঠে চাপায় মোহরের বোঝা।

ঘোড়া ছোটে। মনে মনে সে ভাবতে থাকে জেতা মোহর দিয়ে দু-দাদার বিয়ের অনুষ্ঠান হবে খাসা।

ভোজ।

হবে রাজকীয়।



আমি একজন কিশোর, প্রচুর বন্ধু আমার এমন কী বাংলাদেশেও।

আমার ইচ্ছাই হল — বন্ধু স্থাপন করা। আমি মাঝে মাঝে মত্তহারা হয়ে, কখন চকিতে তবলা বাজিয়ে গান করি। তোমরা একথা শুনে বোধহয় হাসছ ? তাই না ? আসলে গান-এ মত্তহারা হলে না, এরকম হতে হয়।

আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, ব্যায়াম নিয়মিত চর্চা করি। কবিতা, ছড়া, গল্প লিখি। এছাড়া ছবিও আঁকি।

আমার সাথে যার অবিকল মিলে যাবে, সেই হবে আমার বন্ধু। তবে প্রথমে কয়েকটি প্রশ্ন করব, তাতে যে উত্তীর্ণ হবে, সে হবে শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

শ্রীশ্যামল ব্যানার্জী, প্রযত্নে মানস বসু রায়
'হৈমন্তিকা', গ্রাম ঃ সুভাষ পল্লী,
ডাকঘর ঃ শিলিগুলি—৭৩৪৪০১
জিলা ঃ দার্জিলিঙ

সব জেলার বন্ধু হবো—

আমার নাম প্রদীপ দত্ত। হাজরা রোড, কলকাতা—২৬ এর রণদেব গোস্বামী আমার প্রিয় পত্রবন্ধু। আমি সব জেলার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে রাজী আছি। ছোটবড় সবার সাথে বন্ধুত্ব করতে আমি বেশী ভালবাসি। হাতের কাছে পেন রেডি, পত্র পেলেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবো।

প্রদীপকুমার দত্ত, ময়রাপাড়া, পোড়ামাঠ,
উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পিন-৭১১৩১৫

খেলা আর পড়া

আমার প্রিয় সখ ক্রিকেট খেলা। তাছাড়া আমি নানা লেখকের গল্পের বইও পড়েছি। ফুটবলও খেলি। কিন্তু প্রিয় ক্রিকেট। প্রিয় বন্ধু তোমরা আমার ঠিকানা দেখে এক্ষুণি পত্র দাও এবং আমার পত্রবন্ধু হও।

অরুণাভ নাথ, প্রযত্নে সত্যরঞ্জন নাথ
পোঃ জেমো রাজবাটি, কান্দী,
মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৭

প্রশ্ন প্রশ্ন খেলা

বন্ধুত্ব আমার সখ। তা বলে খুশীমত একরাশ কথা লিখে চিঠি ভর্তি করাটা ভাল লাগে না। তাহলে কেমন বন্ধুত্ব। বলছি শোনো। তুমি একটা জটিল প্রশ্ন করবে। আমি বইপত্র খুঁজে উত্তর লিখে পাঠাব। আবার উত্তরে আরেকটা প্রশ্ন দেবো। তুমিও উত্তর লিখবে, সেই সঙ্গে পাঠাবে নতুন প্রশ্ন ব্যস এবার দাও দেখি তোমার প্রশ্ন চিঠি।

সুরজিৎ নন্দী, ১৩ উপেন্দ্রনাথ নন্দী রোড
শেওড়াফুলি, হুগলী।

বন্ধু চাই

প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে চিঠি লেখ। বাংলা বা ইংরাজীতে লিখবে। যদিও বাংলা খুব ভাল জানিনা। তবু বাংলা পড়া ও লেখার চেষ্টা করি। আমার সখ বন্ধুত্ব ও গান শোনা। আমার ঠিকানা দেখে নাও। তোমাদের চিঠির আশায় রইলাম।

Samir Kumar, 38-2 Maharani Indira
Debi Road, Calcutta-700060



শোচতা হ্যায় কি আমরা ঘুমিয়ে আছি অ্যা? হোয়াট? জবাব কেন নেহি দেতা হ্যায়।

বোঝা যায় টুবু রেগে লাল। না হলে ত্রিভাষায় কথা বলত না। তিন চারটে লাফ ঝাপও মেরেছে। হনুমানের মতন। এর অঙ্গ। এ গোলমাল সেই ব্যাপারে। বুবুর ঘুম তাই ভেঙেছে। সে কথা দিয়েছিল দাদা টুবুর সঙ্গে এক সাথে জেগে থাকবে। ফুল চোর ধরবে। এত কষ্ট করে ফুল গাছ গুলো লাগান। কত জায়গা ঘুরে ঘুরে এগুলো জোগাড় করা হয়েছে। ভীষন দুঃখ পায় সে।

শুধু জিনিয়া, ডালিয়া, মান্টিকুষ্টো, গ্লাড্রিয়লি আর ভাজিনিয়াই নয় তাদের বাগানে বিদেশী ফুল গাছের সঙ্গে মিলে-মিশে স্বদেশী অনেক ফুল গাছও আছে। যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, বেলফুল আরও কত কি। নানা রকমের গোলাপ। সাদা লাল ব্লাক প্রিন্স। নানা রঙের বিভিন্ন প্রজাপতির ক্যাক্টাস। ফুল গুলো প্রত্যেকদিন চুরি হয়ে যায়। অনেক

ফুল চোর

নির্মল কুমার ঘোষ



আচমকা চিৎকার চেঁচামেচিতে বুবুর ঘুম ভেঙে যায়। গোলমালটা কিসের কোথাথেকে আসছে বুঝবার চেষ্টা করে সে সতর্ক হয়। বুবু ছোট। সে জেগে থাকবে কথা দিয়েছিল। তার দাদা টুবুকে। কথা রাখতে পারেনি।

বছর পাঁচেক এর মধ্যে এদের একবার বদলী হতে হয়। বাবার চাকরীটা ভারত সরকারের অধীন। তাই সারা ভারতের যে কোন জায়গায় তারা বদলী হতে পারে। পর পর দু-দুটো রাষ্ট্র ভাষার প্রধান শহর ঘুরে আবার এখানে এই শহরে ফিরে এসেছে এরা। টুবু তাই রাষ্ট্র ভাষায়ও বিশেষ পারদর্শী বলে নিজেকে ভাবে। টুবু রেগে গেলে উত্তেজিত হয়ে ইংরাজী-হিন্দী ও বাংলা সব ভাষা ভেজাল দিয়ে কথা বলে।

হোয়াট ডু ইউ চিন্তা করছ, অ্যা? তুমলোগ

চেষ্টা করে তারা দুভাই চোর ধরতে পারেনি। আচ্ছা বেশ ফুল গুলো চুরি হয় ত হলো, কিন্তু ডাল পালা ভাঙ্গা কেন? গাছ শুদ্ধু কখনও আবার উপড়ে নিয়ে যায়।

অনেকদিন দু ভাই জেগে থেকে পাহারা দিয়েছে। ভোর রাতে উঠে দেখেছে। কিছুতেই চোরকে ধরতে পারেনি। চোরটা বড়ো চালাক। এরা ভেবেছিল চোর ধরতে পারলে একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত ব্যবস্থা করেই ছাড়বে। চোর এদের চাইতেও কম সাবধান নয়। এখনও পর্য্যন্ত ধরা পড়েনি। যতদিন যায় রাগ তত বাড়ে। আর ভাবে ধরতে একবার পারলে হয়। দেখাবে মজাটা। ফুল চুরি করার ঝামেলাটা কেমন হয়। সে সুযোগ তারা পায়নি।

টুবু একবার মাথা খাটিয়ে ফুল বাগানের ভাল ভাল গাছ গুলোতে ইলেক্ট্রিকের তার জড়িয়ে রেখে-ছিল। কারেন্টের কাজটা সে ইস্কুলের কর্ম শিক্ষায় ভাল ভাবেই কলিং বেল বানাতে গিয়ে শিখেছিল। ভেবেছিল ফুল চোর যেই গাছে হাত দেবে ফুল টানতে ওমনি কারেন্ট খেয়ে 'হাউ-মাউ'। বাড়ীর সবাই জেগে গিয়ে ধরে ফেলবে।

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখে সে এক কান্ড। ইলেকট্রিকের তার ঠিকই লাগিয়েছিল টুবু। ভাল ভাল ফুল গাছ গুলো বেছে-বেছে। যে গাছ গুলো থেকে প্রতিদিন বেশী ফুল চুরি হয় সেই গাছ গুলোর গায়ে ইলেক্ট্রিকের পজেটিভ জুড়ে রেখেছিল। হাত দিলেই চোর বাছাধন যাতে ছাগলের মতন ব্যাঁ ব্যাঁ করে ডাকে। কিছুই না। তার লাগান যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। সেই সব গাছ গুলোতে শুধু একটাও ফুল নেই। সব ফুল চুরি হয়ে গেছে। এমনকি ডালপালা পর্য্যন্ত অনেক গাছের ভাঙ্গা। গোটা বাগানটাই উলোট-পালোট। যেন কোন এক দৈত্য-দানব এসে ফুল গাছ গুলো মাড়িয়ে গেছে। রাগে দুঃখে টুবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

টুবু ভুলে গিয়েছিল। আনমনে কারেন্ট লাগানো গাছে হাত দিতেই 'উরে বাসরে। বলে চেঁচিয়ে ওঠে। পুরো গাছে কারেন্ট। তাহলে গাছের ফুল কি করে চুরি হল? সে অবাক হয়ে যায়। ফিরে এসে মাকে জানায় ব্যাপারটা। বাবা বাড়ীতে নেই। বাজারে গেছেন মাছ আনতে।

গাছে কারেন্ট দেওয়া আছে অথচ সব ফুল চুরি হয়েছে।

ওরে গাধা, কাল রাত্রে কারেন্ট ছিল না। বিশেষ করে ভোর রাত্রে। আমি উঠেছিলাম একবার ভোর চারটের পর। সুইচ অন করেলে বাতি জ্বলল না। হয়তো তখনই কিংবা তার পরে, যখন কারেন্ট ছিল না তখন ফুল চুরি হয়েছে। ওসব কারেন্ট ফারেন্ট দিয়ে রাখিস না টুবু। অনেকদিন আগে দৈনিক কাগজে পড়েছিলাম, মালদায় কে একজন কাঁঠাল গাছে কারেন্ট দিয়ে রেখেছিল। তার গাছের কাঁঠাল চুরি বন্ধ করতে। কাঁঠাল চোর সেই গাছে হাত দিয়েই মারা যায়। সেটা ছিল অনেক শক্তিশালী কারেন্ট। তারপর থানা পুলিশ। নানা ঝামেলা। সারা রাত তোরা মোষের মতন না ঘুমিয়ে যদি পারিস জেগে থেকে চোর ধর। কারেন্ট দেওয়ার কথা তোদের বাবা জানলে রাগ করবে। এতে যে কোন রকম বিপদ হতে পারে। দেখিস নি বিজলীবাতির স্তম্ভের গায়ে মরার খুলি আর হাড় চিহ্ন। ওটা বিপদের সংকেত।

কাঁঠাল চোর কারেন্ট খেয়ে মারা গেছে শুনে মনে বড় কষ্ট পায় বুবু। একটা কাঁঠালই তো ব্যাপার। সেজন্যে লোকটা মারা গেল। টুবু আর দেরী না করে মেইন-সুইচ্ অফ করে ফুল বাগান থেকে সব ইলেক্ট্রিকের তার গুটিয়ে আনে। যে কোন ঝামেলা সে এড়িয়ে যেতে চায়। তারপর অনেক দিন ভেবেছে। রাত জেগে পাহারা দেবে। পারেনি। ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর ঠিক চারটের সময় ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছে। এলার্মও বেজেছিল। ওরা ওঠেনি। এলার্ম বন্ধ করবার জিনিষটা টিপে দিয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সকাল বেলায় উঠে দেখে কোন ব্যতিক্রম নেই। ফুলগুলো সব চুরি হয়ে গেছে।

অনেকদিন অপেক্ষা করবার পর এতদিন পরে সেইদিন ফিরে পেয়েছে এরা। বুবু ঘুমিয়ে পড়লেও টুবু একেবারে ঘুমিয়ে পড়েনি। সামান্য একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল হয়তো। জানালার পাশেই ছিল

কামিনী ফুল গাছ। অনেকদিনের পুরনো গাছ। বেশ বড়ো। একটা গাছের ডাল ধরে নীচে টেনে এনে আবার ছেড়ে দিলে যেমন শব্দ হয় তেমন একটা শব্দ হল আচমকা। শুধু শব্দই নয়। ডালটা ফিরে এসে যেন খুব জোরে জানালায় একটা বাড়ি মারল। ঐ শব্দ টুকুই যথেষ্ট। টুবুর তন্দ্রা ছুটে যায়। খুব আস্তে-আস্তে সে পেছন দিকের দরজা খুলে বাইরে এসে দেখে, মূর্তিমান চোর ফুল গাছের আড়ালেই চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে। হয়তো টুবুর পায়ের শব্দ পেয়েছে। এগাছ থেকে সেগাছ সব গাছ থেকে ফুল গুলো তুলে নিয়ে নিজে বাঁ হাতে ধরা ফুলের সাঁজিতে রাখছে। আর যায় কোথায়। চিৎকার চেঁচামেচি। টুবু একাই একশ।

চোর— চোর। চোর পাকড়ায়া। হয়ার ইউ আর যাতা হ্যাঁয়, ইধার খাঁড়া থাক। বেটা চোর কাহাকা। আজ এখুনি তুমকো প্রচণ্ড ধোলাই করেগা। ইত্যাদি নানা রকম কথা বার্তা।

বুবুর ঘুমটা টুবুর চেঁচামেচিতেই ভাঙ্গে। বুবু গুটি গুটি বাইরে বেরিয়ে আসে। ভয়ও পায়। সে শুনেছে চোরটোরের গায়ের জোর টোর বেশী হয়। উল্টে যদি আমাদেরই মার ধোর করে? সে ভাবে মা বাবাকেও চেঁচিয়ে মেচিয়ে ডাকতে শুরু করি। মা বাবাও উঠে পড়েন।

বুবু দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। টুবুর বয়সী একটা মেয়ে। অনাহার ও অপুষ্টির জন্যে তার শরীর বড়ো কঙ্কাল। লিকলিকে। গায়ে ময়লা শতছিন্ন তালি মারা একটা ফ্রক জাতীয় কিছু। চুল-গুলো অনেকদিন আঁচড়ানো হয় না। তেল জল পড়ার কোন চিহ্ন মাত্র নেই। গায়ের রঙ বেশ কালো। বস্তী বাসী কিংবা ছেঁড়া ময়লা কাগজ কুড়িয়ে বেড়ান চটের বস্তা পেছনে নিয়ে ঘোরা ছেলে মেয়েদের মতন চেহারা। এ আবার একটা চোর নাকি? এই রকম একটা মেয়ের কাছ থেকে বুবুর মা প্রায়ই মাটি কেনেন। মেয়েটি রোজ সকালে ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁকে যায়—

মাটি লেবেন গো মাটি? বুবুই একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল "তোরা মাটি কোথা থেকে আনিস রে?"

হুই মহানন্দা নদী থেকে। বিনা পয়সায় পাই গো দাদা বাবু। মাত্র দশ পয়সায় কতখানি মাটি দিই দেখো। আজকের দিনে দশ পয়সার মাটি বিক্রী করে কী কিছু হয়?

বুবু কিছু বলতে পারেনি। তার মা মাটি রাখেন। উনুন নিকোবার জন্যে। শহরের বালি মাটি দিয়ে উনুন নিকোনো যায় না। আঁঠালো মাটির দরকার। তাই এদের কাছ থেকে কিনতে হয়। বুবু ঠিক চিনতে পারে। এ যে সেই মেয়েটাই। ওর নাম ও জিজ্ঞাসা করেছিল সেদিন। মেয়েটি বলেছিল তার নাম 'ফুলিয়া'।

টুবু বলে: দেখ্‌নেমে ত তুমকো বিহার বাসী বলে মনে হোতা হ্যায়। হোয়াট ইজ তোমার নেম? তুমহারা নাম কেয়া হ্যাঁয়?

ফুলিয়া গো দাদাবাবু।

তুই আমাদের বাড়িতে মাটি বিক্রী করতে আসিস না? বুবু বলে।

হ্যাঁ গো দাদা বাবু। কালই তো আপনার মা মাটি নিলেন বিশ পয়সার।

তা বাছাধন, কিত্‌না দিন্‌সে তুম আমাদের ফুল চুরি করতা হ্যাঁয় অ্যা? টুবু বলে?

অনেক দিন থেকে আমি ফুল তুলি গো দাদাবাবু। ফুলিয়া বলে।

চোরের স্বীকারোক্তিতে বুবু খুসি হয়। টুবু রেগে গিয়ে ফুলিয়ার ফুল শুদ্ধ হাত জোর করে চেপে ধরে।

বুবু বলে, 'ছেড়ে দে দাদা ওর হাত। ফুলিয়া পালাবে না ওতো আমাদের বাড়িতে মাটি বিক্রী করতে আসে রোজ সকালে।'

টুবু আরও রেগে যায় বলে, মামদো বাজী পায়া হ্যাঁয়। ছোড়েগা নেহি হাম খুব জোরসে ধোলাই করেগা। বলেই মাথায় গোটা দুয়েক গাট্টা মারে গালে দুচারটে চড় চাপড়। ফুলিয়া জোরে কেঁদে ওঠে। আর এমন কাজ করবো না। দাদাবাবু আমাকে ছেড়ে দিন। এই আপনার পা ধরেছি।

আচ্ছা তুই ফুল চুরি করিস ত গাছের ডাল পালা ভাঙিস কেন রে? বুবু বলে একটু নরম গলায়।

থাম তুই। দয়ার সাগর একেবারে বিদ্যাসাগর এসেছেন? চোর ছ্যাচোড়দের আমি কেমন ব্যবহার করতে হয় আমি জানি।

টুবু খুব জোরে আবার একটা গাট্টা মেরে বলল, "কেমন লাগতা হ্যায় দেখ্!"

ফুলিয়া চিৎকার করে কেঁদে উঠল। চিৎকার চেঁচামেচিতে বুবু-টুবুর বাবা মা বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাদের ঘুম অনেক আগেই ভেঙেছিল। ফুল চোর যখন ধরা পড়েছে তখন একটা ব্যবস্থা করতে হয়। ফুলিয়াকে দেখে বুবু-টুবুর মা ঠিকই চিনতে পারলেন। তিনি বলেন, "কীরে রে, তুই মাটি বিক্রী করিস না? আমিত মাটি কিনি তোর কাছ থেকে?"

ঃ হ্যাঁ মা। বিক্রী করি।

'মা' কথাটা শুনে বুবু-টুবুর মায়ের মন অনেকখানি নরম হয়ে যায়। তিনি বলেন, "এই টুবু, এর হাত ছেড়ে দে।"

বুবু-টুবুর বাবা বলেন, "বেশতো মাটি বিক্রী করিস ত আবার ফুল চুরি করিস কেন?

কী করবো বাবা। মাটি বিক্রী করে আমাদের সংসার চলেনা। এক ঝাঁকা মাটি বিক্রী করে দেড়-দুটাকাও হয় না। তিন টাকা চালের কিলো। তাও খারাপ চাল। আমরা মা-বাবা ভাই-বোন মিলে আট-নজন। বাবা একা সংসার চালাতে পারে না।

ঃ তোরা বিহারী না? এত সুন্দর বাংলা ভাষা শিখলি কী করে রে?

ঃ আমার জন্মের অনেক আগে থেকেই আমার বাবা এখানে আছেন। আমরা সবাই বাংলা কথা বলি। মা ত আমার বাঙালী। হিন্দী আমরা জানিনা বললে ভুল হবে। ঐ ভাষায় আমরা আর কথা বলি না। জন্ম অবধি বাংলায় কথা বলছি বলে হয়তো সহজে শিখে গেছি আপনাদের ভাষাটা। অবশ্য এটা এখন আমাদেরও ভাষা। এই দেশেই ত থাকতে হবে।

ঃ টুবু বলে, 'বড়ো লম্বা লম্বা কথা কেমন বলে তোমরা দেখ।"

ঃ বুবু-টুবুর বাবা ধমক দেন ... থাম টুবু।"

ঃ "ফুল চুরি করে কী করিস?" ... মা বলেন।

ঃ গুলো দিয়ে মালা বানাই। সেই মালা আর ঝরো ফুল শহরের মন্দিরে-মন্দিরে ফেরি করি।

ঃ এ বহত বক্তৃতা দেতা হ্যায়।

ঃ ছেড়ে দে দাদা। ওরা খুব কষ্টে থাকে।

ফুলিয়া হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকে। বুবু-টুবুর মা-বাবা ওকে ছেড়ে দিতে বলেন।

ভয়ে-ভয়ে তাড়াতাড়ি তুলতে গিয়ে ... ডাল ভেঙ্গে যায় গো মা। আর কোনদিন গাছ ভাঙবো না। আপনাদের ডাকবো। ফুলিয়া বলে।

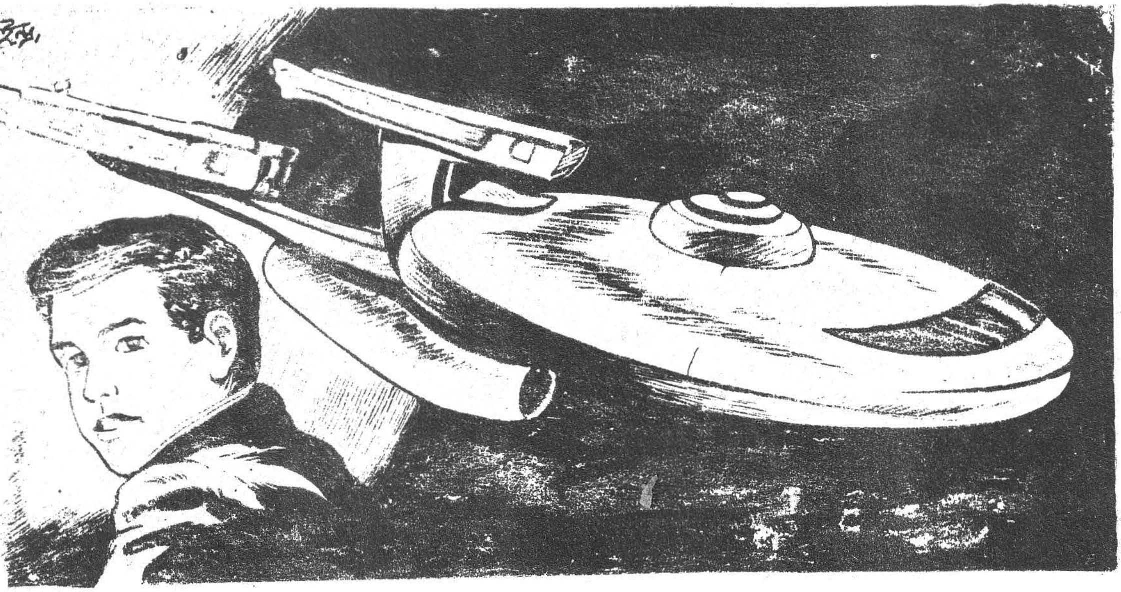
বুবু ঘরের দিকে দৌড়ে যায়। টুবুর শরীরে অনেকখানি রাগ ছিল। মা বাবার সামনে কিছুই করতে পারল না। তাই নিজের মনে খুব কষ্ট পায়। রাগটা বুবুর পরে গিয়ে পড়ে। বুবুকে খুব জোরে ডাকতে থাকে। গোটা [illegible] গাট্টা মারতে ইচ্ছা করে তার।

বুবু-টুবুর মা বাবা ঘরে ফিরে আসেন। ফুলিয়া লোহার রেলিং দেওয়া গেট খুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। মাথা তার নীচু। ফুলের সাজির দিকে তাকিয়ে দেখে সামান্য কটা মাত্র ফুল পড়ে আছে। পঞ্চাশ পয়সাও পাওয়া যাবে কিনা সে ভাবতে থাকে।

টুবু-বুবুকে খুঁজে বেড়ায়। বুবু তুই কোথায়? তার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। হঠাৎ রাস্তার দিকের জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখে বুবু ফুলিয়ার সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। সামনে এগিয়ে যাচ্ছে যেন কত দিনের চেনা। বুবুকে ঐ ভাবে যেতে দেখে মাকে ডেকে বলে টুবু— "মা দেখো, বুবুর কাণ্ড। ঐ চোর মেয়েটার সাথে গল্প করতে করতে যাচ্ছে।" ওদের মা বাবা দেখে অবাক হয়ে যান। সত্যিই ত বুবু কী বলছে ওকে?

এর মধ্যেই বুবু ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে টুবু বুবুর কান ধরে টেনে জিজ্ঞাসা করে "কী, ব্যাপার কী? ওকে কী বলছিলি রে?"

ঃ আমার টিফিনের জমানো পয়সা থেকে দুটো টাকা দিয়ে এলাম ফুলিয়াকে। কিছুতেই নেবে না সে। অনেক সাধ্যি সাধনা করে দিয়ে এলাম। টুবু কান ছেড়ে দেয়। মাথা নীচু করে চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে।



নতুন গ্রহের দেশে

দীপক বসু

প্রসেনজিত দেখল যে একটা সমুদ্রের তীরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বেলাভূমির ওপর সোনালী রোদ এসে পড়ায় অভ্রের কণাগুলো হীরের মত জ্বলছে। দূরে সমুদ্র সৈকতের ওপর রকেটটি বিধ্বস্ত হয়ে আছড়ে পড়েছে। ওই আধুনিক রকেটে চড়ে প্রসেনজিত এবং আরো তিনজন নভশ্চর ভারতবর্ষ থেকে পাড়ি দিয়েছিল চন্দ্রগ্রহের উদ্দেশে। দশদিন পর রকেটটি তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে দিক ভ্রষ্ট হয়ে পাহাড়ের সংগে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ে অজানা এক সমুদ্র উপকূলে!

প্রসেনজিত বালুরাশির ওপর উঠে বসার জন্য অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কোনক্রমে শুধু পাশ ফিরে শুল। আর ঠিক তখনই অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর জুড়েই তার ব্যথা। সে রৌদ্র ঝলকিত সমুদ্র তীরে যতদূর চোখ যায় দৃষ্টি চালিয়ে তার নভশ্চর সংগীদের খোঁজার চেষ্টা করল। একজনকেও সে চোখের নাগালে দেখতে পেল না। তার সংগীরা কি তাহলে রকেট থেকে পড়ে ওই উত্তাল সমুদ্রে ডুবে গেছে? প্রসেনজিত অবাক হয়ে দেখল তার পোষাকের রং সম্পূর্ণ হলুদ হয়ে গেছে। অথচ সে যখন পৃথিবী থেকে মহাশূণ্যে পাড়ি দিয়েছিল তখন তার পোষাকের রং ছিল সাদা। রং পরিরর্তন হওয়ার তো কথা নয়। তাহলে কি সে নতুন কোন গ্রহে এসে পড়েছে?

সে তার ইলেকট্রনিক অটোমেটিক ঘড়িতে দেখল কুড়ি পয়েন্ট দশ! অর্থাৎ ভারতীয় সময় এখন রাত আটটা দশ। কিন্তু এখন সূর্যের আলো দেখে বোঝা যায় সকাল নটার বেশী বেলা হয়নি। জল পিপাসায় প্রসেনজিতের বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সে কোমরের বেল্টের ফাঁসটা খুলে ফেলতেই তার দেহ থেকে নভশ্চরের পোষাকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সে অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে সমুদ্রের কাছে গিয়ে উপুর হয়ে লোনা জল পান করল। আর ঠিক তখনই প্রায় আট ফুট লম্বা কতকগুলো মানুষ এসে প্রসেনজিতের চারপাশে দাঁড়াল। প্রসেনজিত অবাক হয়ে দেখল মানুষগুলোর শরীরের বর্ণও হলুদ। ওদের পরণে হলুদ পাতা! সকলেরই হাতে রয়েছে সরু বর্শার মত পাথরের ধারালো অস্ত্র। ওরা প্রসেনজিতকে উদ্দেশ্য করে হাত নেড়ে ইশারায় কি যেন বলাবলি করছে। কেউ শব্দ করে কথা বলছে না! সকলেই ইংগিতে কথা বলছে। যে কথার মানে বোঝা প্রসেনজিতের পক্ষে খুবই কষ্ট-

কর। তাহলে ওই মানুষগুলো কি বোবা না ওদের কথা বলতে কোন ধর্মীয় নিষেধ আছে। প্রসেন-জিতের এখন ভয় করছে। সে ভাবল তাকে যদি ওরা মেরেও ফেলে তাহলে ওকে বাঁচাবার কেউ নেই।

প্রসেনজিত ওদের সকলের উদ্দেশে করুণস্বরে বলল—আই এ্যাম এ ইণ্ডিয়ান পীপল, প্লীজ হেলপ মী।' হলুদ রঙের মানুষগুলো তার কথার মানে বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারল না। ওরা ফ্যালফ্যাল করে আহত প্রসেনজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেদের মধ্যে ইংগিতে কি যেন বলতে লাগল। হয়ত ওরা কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। ওদের মধ্যে একজন বয়স্ক লোক ইংগিতে অরে একজনকে কিছু নির্দেশ করল। দুজন ছুটে কোথায় যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ওরা মাটির পাত্রে হলুদ জলের মত একরকম বস্তু নিয়ে এসে প্রসেনজিতকে ইশারায় পান করার জন্য অনুরোধ করল। প্রসেনজিত বুঝল যস্মিন দেশে যদাচার। কোন বিদেশী অতিথিকে ওরা হয়ত এই ভাবেই আপ্যায়ণ করে।

সে প্রথমে একটু সংকোচ করে মাটির পাত্রের হলুদ জল পান করল। আশ্চর্য পান করার পর তার শরীরের সমস্ত ব্যথা বেদনা এক নিমেষেই নিঃশেষ হয়ে গেল। সে অনুভব করল তার জীবনী শক্তি যেন হাজার গুণ বেড়ে গেছে। প্রসেনজিত এক জনের হাত ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। সে দেখতে পেল দূর পাহাড়ের কোল ঘেঁসে নিবিড় বনানী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কতগুলো হলুদ পাখি আকাশের বুকে বৃত্ত রচনা করে বনানীর দিকে উড়ে চলেছে। কয়েকটা পালক ঝরে পড়ল সমুদ্র সৈকতে।

প্রসেনজিতের হঠাৎ রকেটের কথা মনে পড়তেই তার মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। বিধ্বস্ত প্রাণ হীন রকেটটির কাছে আসতেই মনে পড়ল তার নভ-শ্চর সঙ্গীদের কথা। তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে। প্রসেনজিত এখন বুঝতে পেরেছে সে অনাবিষ্কৃত এক নতুন গ্রহে এসে পড়েছে। মনে পড়ল তার ফেলে আসা পৃথিবীর মানুষের কথা। মার কথা তার সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ছে।

প্রসেনজিতের চোখে জল দেখে নতুন গ্রহের হলুদ বর্ণের মানুষগুলো ওর কাছে এসে ইশারায় ওকে কাঁদতে নিষেধ করল। একজন ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে হাত ধরে একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে নিয়ে এল। গুহার ভিতরে প্রবেশ করে প্রসেনজিতের মনে হোল যেন সে একটি সুন্দর মনোরম রাজ-প্রাসাদের মধ্যে এসেছে। প্রাসাদের ভিতর মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখা গেল অনেক মানুষ মেঝেতে বসে আছে। প্রসেনজিতকে দেখেই ওরা সকলেই নতজানু হয়ে সম্মান প্রদর্শন করল। প্রসেনজিতের মনে হলো সে যেন ওদের কাছে ঈশ্বর প্রেরিত দুত। কয়েকজন এসে তাকে পাথরের সিংহাসনে নিয়ে বসালো। আর ঠিক তখনই নতুন গ্রহের মানুষগুলো প্রাসাদ কাঁপিয়ে প্রথম কথা বলল, 'গাগোর' ওদের দুর্বোধ্য ভাষার অর্থ না বুঝলেও সে জানতে পারল তাকে ওরা রাজা করেছে। রাজ সিংহাসনে বসে সে আনন্দে হাসতে লাগল।

এই প্রসেন হাসছিস কেন?' প্রসেনজিতের মা মাঝরাতে বিছানায় শুয়ে বললেন।

প্রসেনজিতের তখন ঘুমটা ভেঙে গেছে। সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—'মা আমি নতুন গ্রহের রাজা হয়েছি। এবার আমি তোমার সব দুঃখ দূর করে দেব।' প্রসেনজিতের মা ফ্যালফ্যাল করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

প্রতিভা প্রতিযোগিতা

ছোটদের আসরের পরিচালনায় ছোট গল্প (কিশোর মনের উপযোগী) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় যে কোন লেখক-লেখিকা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। গ্রাহক না হলেও চলবে। ৮ থেকে ৯৮ বয়স হলেও যোগ দিতে পারবে।

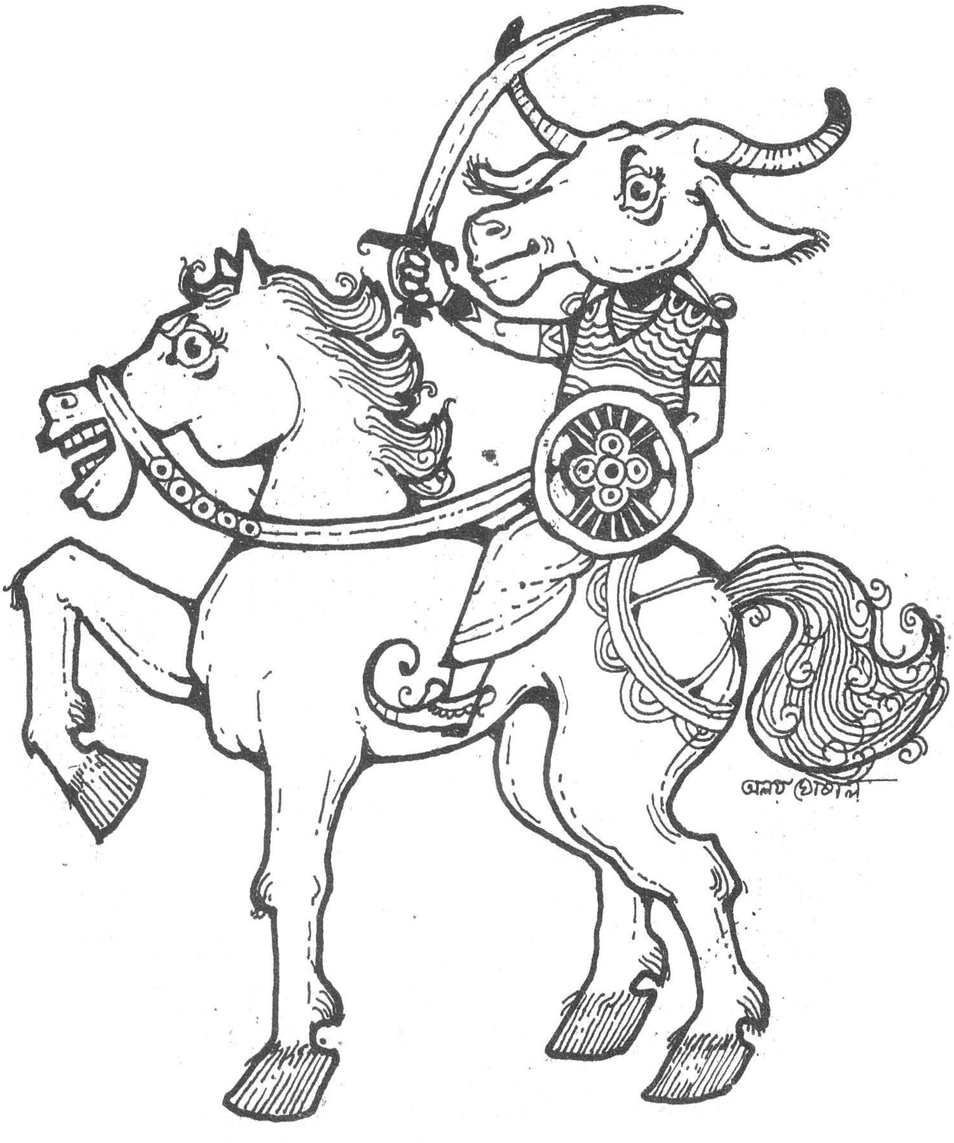
শব্দ সংখ্যা ১,৫০০। গল্পের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় থাকছে না। যেমন খুশী বিষয় অব-লম্বনে গল্প লিখলে গ্রহণ করা হবে।

তার বেশি যে চাইছে, তার

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জাপানদেশের ওকলাহোলায়
সেই ছেলেটি ছুঁড়তো বোমা।
ছেলেটির তো হলোই ফাঁসি,
দুগ্গাঠাকুর বাজায় কাঁসি,
পিদ্দিমেতে সলতে পোড়ে,
অসুর থাকে ঘোড়ায় চড়ে!

আর মৃদঙ্গ অস্টরম্ভা
পুরুত কইছে, কী সে কমবা ?
মন্ত্রপূত শান্তিবারি,
চোদ্দ ফোঁটা দিতেই পারি।
তার বেশি যে চাইছে, তার
কলকাতা নয়, কোচবিহার!

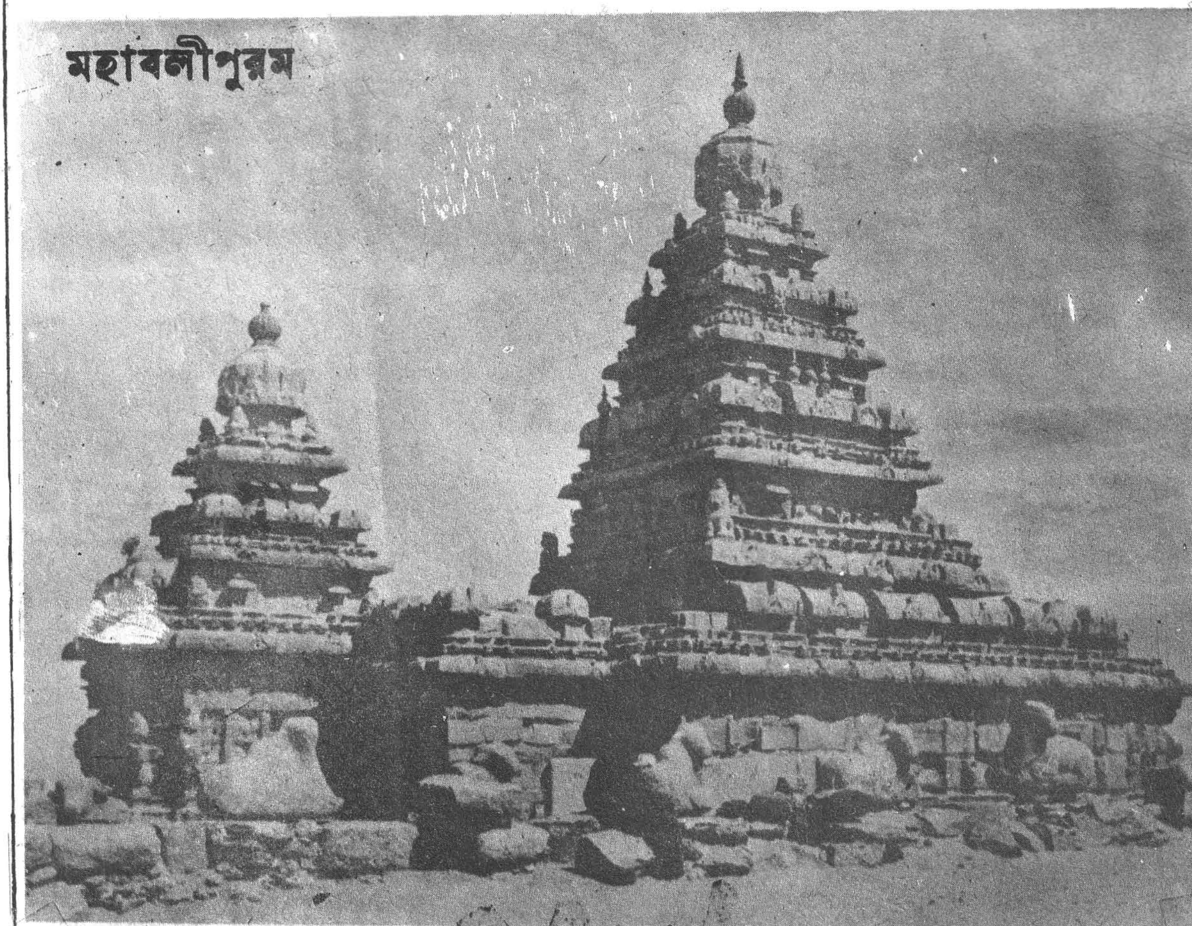


আমার দেশ

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ শহরের ৫৩ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে মহাবলীপুরম। জায়গাটিকে 'সেভেন প্যাগোডা'ও বলে। এর আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হল ছোট পাহাড় কেটে তৈরী মন্দির এবং পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার বিষয়। ইতিহাসে জানা যায় যে ষষ্ঠ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পল্লবদের রাজত্বকালে এগুলি করা হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দীতে এগুলির অনেক ক্ষতি হয়েছে। সাতটি মন্দিরের মধ্যে বর্তমানে কেবল একটি ভাল অবস্থায় আছে। সমুদ্রের ধারের এই মন্দিরটিকে 'শোর টেম্পল' বলে। এই মন্দিরটি ৬৯০–৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজসিংহ নরসিংহবর্মণ ১-এর রাজত্বকালে পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছিল। এই মন্দিরটি ছাড়া ওখানে আছে মহিষাসুর মণ্ডপ, অর্জুনের তপস্যা (পাহাড়ের গায়ে), গণেশ রথ ও বরাহ মণ্ডপ প্রভৃতি। এগুলিতে এখনও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করছে। মহিষাসুর মণ্ডপে শোয়া অবস্থায় বিষ্ণুর একটি সুন্দর মূর্তি আছে।

মাদ্রাজ থেকে বাসে বা মোটরে মহাবলীপুরম যাওয়া যায়। পথের দুধারে ধানক্ষেত এবং তাল, নারকেলের সারি দেখতে সুন্দর লাগে।

আলোকচিত্র ও বিবরণ—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়।



আজ তোমাদের একজন অতি সাধারণ নারীর অসাধারণ সাহসিকতার এক গল্প বলব :

নাম তার, গ্ল্যাডিস, আইলওয়ার্ড, পেশা ছিল পরিচারিকার। লণ্ডনের এই মেয়ে একদা কৃত সংকল্প হল চীন দেশে মিশনারী হিসেবে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কর্তৃপক্ষ তাকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করে প্রার্থনা নামঞ্জুর করে দিল।

কিন্তু এ মেয়েকে রোখা গেল না। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে যাবার মত উপযুক্ত টাকা জমিয়ে, এক সময় সারা ইয়োরোপ এবং সাইবেরিয়া পাড়ি দিয়ে সে গিয়ে উপস্থিত হল চীনের শহর টিয়েন্টসিন-এ। অজস্র বাধা বিপদ ও অ্যাডভেঞ্চারের পথ অতিক্রম করে সে এরপর গিয়ে ইয়াং চেঙ্গ নামক ছোট্ট শহর-টিতে বসবাস শুরু করলো। সেখানে অল্পদিনের মধ্যে সেখানকার কথা ভাষা শিখে নিল। এক সময়, শহরের চীনে জন সাধারণের একজন হয়ে গেল সে।

ইয়াং চেং—এ দুবছর কাটবার পরই ঘটলো সেই চাঞ্চল্যকর এবং রোমহর্ষক ঘটনাটা।

মিসেস স্মিথ নাম্নী এক মহিলা লু উংচেঙ্গ নামক সদ্য ক্রিশ্চান হওয়া এক চীনে যুবককে পাঠিয়েছিল গ্ল্যাডিস্-এর সঙ্গে কাজ করবার জন্য।

এক সকালে উঠোনে দাঁড়িয়ে ওরা কথাবার্তা বলছে, এমন সময় হন্ত দন্ত হয়ে একজন সরকারি পেয়াদা এসে চীনে যুবকের হাতে রঙিন একটি কাগজ ধরে দিল।

মেয়েটি লু-কে প্রশ্ন করলো, কি লেখা ঐ কাগজে ?

লু বললে, এটা শাষকদের কাছ থেকে আসা একটা শমণ। পুরুষদের জেল—এ প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়েছে কয়েদীদের মধ্যে। নিস্পৃহ কণ্ঠে মেয়েটি বললে, তাই বুঝি ?

—এক্ষুনি আপনারা চলে আসুন, পেয়াদা জরুরী কণ্ঠে বলে ওঠে, ব্যাপারটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ।

মেয়েটি বললে, জেল-এর রায়টের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ?

—এক্ষুনি আপনারা চলে আসুন, পেয়াদার কণ্ঠ-স্বরে দৃঢ়তা, এটা সরকারী আদেশ, একথা মনে রাখবেন।

॥ অসাধারণ সাহসিকতা ॥

[সত্য ঘটনা]

—বীরু চট্টোপাধ্যায়



লু উং চেঙ্গ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নার্ভাসভাবে বললে, সরকারি শমক অলঙ্ঘনীয়। যেতেই হবে।

—বেশ তো, যাও তুমি। দেখ গিয়ে কি ব্যাপার গ্ল্যাডিস বললে, এটা অবশ্যই পুরুষ মানুষের কাজ। আমি জেলের ব্যাপার স্যাপার কিছুই জানি না। জীবনে আমি কখনো জেলে যাইও নি। আর আমি এটাও বুঝতে পারছি না ওখানে তোমারইবা কি কাজ থাকতে পারে।

লু উং চেঙ্গ ও বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

—চলুন, চলুন তাড়াতাড়ি চলুন, পেয়াদাটি তাড়া দেয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লু-উং পেয়াদার পেছন পেছন প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি নিশ্চল ভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে দেখলো লু উং বাঁদিকে গেল আর পেয়াদা গেল ডান দিকে।

কিছুদূর যাবার পর বুঝি পেয়াদার নজরে পড়েছে যে যুবকটি পালিয়েছে আর মেয়েটিও আসে নি। ঝড়ের বেগে ফিরে এসে ক্রুদ্ধ-গর্জনে সে বললে, ব্যাপার কি। সরকারের আদেশ অমান্য? আপনাকেও যেতে হবে। আপনার প্রতিও নির্দেশ আছে যাবার। শিগ্গির চলুন। অমান্য করলে কপালে অকল্পনীয় বিপদ আছে। ছোড়াটা পালিয়েছে দেখছি।

—অল রাইট, শান্ত স্বরে মেয়েটি বললে, আমি যাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি না লু উং চেঙ্গ পালালো কেন। বোধকরি অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা অন্য কিছু ব্যাপার....। হাঙ্গামার ব্যাপারে আমার কী করবার আছে।

দুজনে দ্রুতপদে হেঁটে গিয়ে উপস্থিত হল জেল গেটের সামনে। জেলের ভেতর থেকে বিকট চিৎকার চেঁচামেচি ও ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসছে। ভয়ংকর সোর গোল।

সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাসে ও চিন্তিত মুখ নিয়ে কারাগারে গভর্ণর, তার পেছনে ভীর করে রয়েছে তারই জনা বারো স্টাফ।

—আপনি আসাতে আমরা খুব খুশি হয়েছি, গভর্ণর দ্রুত পায়ে বলে ওঠেন, জেলের মধ্যে প্রচণ্ড হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। কয়েদীরা পরস্পরকে খুন করে ফেলছে।

—সে তো ওদের তর্জন গর্জনেই বুঝতে পারছি, মেয়েটি বলে, কিন্তু আমাকে এ সবের মধ্যে ডাকবার সার্থকতা কি? আমি একজন মিশনারী স্ত্রীলোক মাত্র। আপনারা সৈন্য পাঠাচ্ছেন না কেন রায়ট বন্ধ করতে?

—এখানকার সমস্ত কয়েদীরা সব কুখ্যাত এবং ভয়ংকর খুনে, ডাকাত, চোর। কম্পিত কণ্ঠ গভর্ণরের সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়েছে। সৈন্য সংখ্যাও ওদের তুলনায় নগন্য।

—কিন্তু... কিন্তু.... এ ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কি আশা করেন আপনি? আমি এখনো জানতে পারিনি আমায় কেন আপনি আসতে নির্দেশ দিয়েছেন...।

গভর্ণর এক পা এগিয়ে এসে বললেন, আপনাকে জেলের ভেতরে গিয়ে এ মারামারি থামাতে হবে।

—আমাকে? আমাকে এ অবস্থায় ঢুকতে হবে জেলের ভেতরে, শুনে গ্ল্যাডিস-এর অগাধ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মুখ। ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, অবিশ্বাসে ঝুলে পড়লো ঠোঁট, বলছেন কি আপনি পাগলের মত। ভেতরে ঢুকলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে না?

গভর্ণরের দৃষ্টি এক চুল নড়লোনা মিশনারী মেয়েটির চোখ থেকে, বললেন, ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে কি করে? আপনারা তো প্রত্যেককে ধর্ম প্রচারের বক্তৃতায় বলে বেড়ান যে আপনাদের মধ্যে নাকি স্বয়ং ভগবান অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ইউ হ্যাভ দ্য লিভিং গড ইনসাইড ইউ।

গভর্ণরের মুখে চোখে পরম আস্থা, করুণ আকুতির অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। গ্ল্যাডিস-এর সারা দেহে একটা মৃদু কম্পনের ঢেউ বয়ে গেল একথা শুনে। ঢোক গিলতে গিয়ে দেখে গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে এসেছে।

—দি—লিভিং গড? অস্ফুটে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল রোমাঞ্চকারী লাইনটা।

—প্রত্যেক প্রচার বক্তৃতায় একথা আপনারা বলে থাকেন, রাস্তায়-ঘাটে, পাড়াগাঁয়ে, শহরে। আপনাদের এই প্রচার অর্থাৎ এই কথা যদি সত্যি হয়। মানে ঈশ্বর যদি আপনাদের বিপদ আপদ ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করা আপনার পক্ষে সম্ভব।

গ্ল্যাডিস শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গভর্ণরের দিকে। মনের বিহ্বলতার মধ্যেও সে ভাববার চেষ্টা করলো খুঁজে ফিরতে লাগলো এমন কোন উত্তর যা রাজ পুরুষকে তার ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে বিপথগামী না করে। মনের মধ্যে কটা লাইন বারবার জ্বলতে নিভতে লাগলো অব্যক্তে: এটা সত্যি, ধ্রুব সত্যি। তোমরা প্রচার করে থাকো যে তোমাদের খৃস্টান ঈশ্বর তোমাদের বিপদ আপদ থেকে তোমাদের রক্ষা



করেন। একথা যদি সত্য বলে এই মুহূর্তে প্রমাণ দিতে না পারো তো তোমার দফা রফা হয়ে যাবে এ শহরে তথা এ দেশে। এখনো সময় আছে। যদি পরাজিত হও, যদি নিস্ফল হও চিরকালের মত তুমি শেষ হয়ে গেলে।

এ এক সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জ। যে উপায়েই হোক তাকে মুখ রক্ষা করতেই হবে। উঃ এই সব নির্বোধ সহজ সরল মানুষের দল। কিন্তু মেয়ে হয়ে এই দাঙ্গা বিধ্বস্ত জেল—এর অভ্যন্তর সে যাবেই বা কী করে? ঐ সব হিংস্র হত্যাকারী, চোর ডাকাত বদমাস সংকুল উন্মত্ত কারাগারে তাকে যেতে হবে? তর্জন গর্জন রণহুংকার ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে জেলের রুদ্ধ দেওয়ালের মধ্যে।

—আমাকে অবশ্যই চেষ্টা করে দেখতে হবে, মনে মনে মেয়েটি বলে ওঠে। আমি চেষ্টা করবই, ওহ গড্, আমাকে শক্তি দাও।

সে এবার ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া গভর্ণরের পানে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো, রাইট, আমি ওদের কাছে ভেতরে যাব।

—চাবি! চাবি লাও, গভর্ণর সচিৎকারে নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট চাবি দ্বারা জনৈক প্রহরী লৌহ দরজা খুলে দেয়। মেয়েটিকে প্রায় ঠেলেই ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পেছনে দরজা ফের বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকার। সামনে একটা টানেলের মত রাস্তা। সেটা গিয়ে পড়েছে একটা বিশালাকার চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনে। সেখানে বিরাট একদল হিংস্র কয়েদী অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে খুন করে চলেছে উন্মাদের মত। সেখানে সে একমাত্র মেয়ে দাঁড়িয়ে। দুর্বল পদক্ষেপে গ্ল্যাডিস সে দিকে এগিয়ে গেল। অতঃপর প্রাঙ্গণের মুখে এসে অসহনীয় ভয়াল দৃশ্য দেখে ত্রাসে ও আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

প্রাঙ্গণটির চার দিকে খাঁচার মত লৌহ বেষ্ঠনীর সব প্রচুর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, মাঝখানে ফাঁকা জমি সেখানে চলছে ভয়ংকর সংঘর্ষ। বেশ কিছু কয়েদির রক্তাক্ত মৃত দেহ পড়ে রয়েছে ভূমিতে। হাতে মাংস কাটা বিরাট ছুরি নিয়ে একে অপরকে কোপাচ্ছে? এদের পালের গোদা একজন দীর্ঘ দেহী কয়েদী হাতের ছুরিটা নিয়ে দৌড়ে গেল একদল কয়েদীর দিকে, তারা তন্মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল খাঁচার ভেতর। সামনের একটা লোককে পেয়ে মাথায় আঘাত করতে সঙ্গে সঙ্গে সে ভূমিস্যাৎ হয়ে গেল ফিনকী দেওয়া রক্তপাতের মধ্যে।

অবশ দেহ নিয়ে মিশনারী মেয়ে গ্ল্যাডিস স্থানুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে এই বীভৎস তাণ্ডব চিন্তাশূন্য মন নিয়ে দেখতে লাগলো। কয়েদীরা কেউ ওর দিকে লক্ষ্য করছে না। তিরিশ সেকেণ্ড কাটলো এইভাবে। দীর্ঘকায় উন্মত্ত কয়েদী এবার আরেকজনকে আঘাত হানতে এগিয়ে এসে সামনে গ্ল্যাডিসকে দেখে সহসা

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

কোন কিছু না ভেবে, অর্থাৎ পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই এবং সে কি করতে যাচ্ছে সে কথা চিন্তা না করেই, গ্ল্যাডিস ক্রুদ্ধভাবে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

—দাও, তোমার হাতের ছুরিটা এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমার হাতে দিয়ে দাও, ক্রুদ্ধ-তীক্ষ্ণকণ্ঠে মেয়েটি চিৎকার করে বলে ওঠে।

উন্মত্ত দীর্ঘকায় কয়েদীটি রক্তবর্ণ পাগলা চোখে পুরো তিনচার সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকে মেয়েটির মুখের পানে। দুপা এগিয়ে আসে। অকস্মাৎ, সে হাতের কুঠার রূপী মাংস কাটা ছুরিটা বাড়িয়ে দেয় মেয়েটার দিকে। ঝট করে সেটা নিয়ে নেয় মেয়েটি। সেখানে চারদিক ঘিরে উপস্থিত ৫০। ৬০ জন কয়েদী সহসা থেমে গিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকে গ্ল্যাডিস এর দিকে। সেই প্রলয় নাটকের যাবতীয় অ্যাকসন যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেছে। গ্ল্যাডিস জানে এই মনস্তাত্ত্বিক বশীকরণকে নির্ভীকভাবে চালিয়ে যেতেই হবে। এ সম্মোহনের সুযোগকে কখনোই অপচয় হতে দেবে না।

—তোমরা সকলে, এখানে চলে এস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন। এক্ষুনি চলে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়াও সে বজ্র স্বরে এ নির্দেশ দিল। সে কণ্ঠস্বর বুঝি সে নিজেই চিনতে পারছে না। মনে হল সে যেন তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠের স্কুল শিক্ষিকা, একদল বেয়াদপ ছাত্রীদের ধমকে নির্দেশ দিচ্ছে।

—এই, এইযে তোমরা। এখনো দাঁড়িয়ে কেন··· এসো··· এগিয়ে এসে আমার সামনে এক্ষুনি লাইন করে দাঁড়াও।

একান্ত অনুগত বাধ্য বশংবদের কায়দায় চারদিক থেকে কয়েদীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে আসতে লাগলো। ভ্রূ কুঁচকে রাগত ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে মিশ-নারী মেয়েটি। অকস্মাৎ ওর মন থেকে ভীতি ভাব একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার পরিবর্তে সারা অন্তঃকরণে করুণার বন্যা এসে চোখ দুটি অশ্রু সজল করে তুললো। কী সাংঘাতিক দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছে অপুষ্টিজনিত শীর্ণকায়, বস্তা-সদৃশ পোষাকপরা এই হতভাগ্য বন্দীর দল। ব্যথা বেদনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ভয় ভীতি, যন্ত্রণা মিশ্রিত মনুষ্য-রূপী প্রেতের সমষ্টি। ধূলি মলিন, নোংরা পরিবেশ, পোষাক পরিচ্ছদ উকুনাকীর্ণ। এরা বুঝি আর মনুষ্য পদবাচ্য নয়, এরা পরিণত হয়েছে ইতরতর প্রাণীতে।

জোর করা কাঠিন্য সহকারে সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তাদের পানে। প্রাধান্য বজায় রাখতেই হবে। কঠোর কণ্ঠে বলে যায় মেয়েটি, ছি ছি তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এই ধরণের জঘন্য আচরণ পশুর অধম কাজ। মেয়েটির চোখ একবার নিহত আহত মানুষদের রক্তাক্ত দেহের ওপর বুলিয়ে এল, গভর্ণর সাহেব আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তদন্ত করবার জন্য। এখন তোমরা যদি এই জঘন্য পরি-বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলো, তাহলে আমি তোমাদের জন্য গভর্ণরের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করব। কথা দিতে হবে ভবিষ্যতে এ ধরণের নারকীয় কার্যে তোমরা আর কখনো লিপ্ত হবে না। এবার খুলে বল অসন্তোষের কি কারণ তোমাদের? কেন তোমরা এভাবে দাঙ্গা শুরু করলে?

কোন জবাব এল না। অধিকাংশ কয়েদী লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—তোমাদের একজন প্রতিনিধি এগিয়ে এসে আমায় সব কিছু জানাও।

কয়েদীরা এরপর পরামর্শ করে মোটামুটি কিছুটা ভাল স্বাস্থ্যের একজনকে ওর কাছে পাঠালো।

—আমার নাম ফেং! বলুন কি বলবার আছে।

লোকটাকে প্রশ্ন করায় জানা গেল সে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বিরুদ্ধবাদী অপর সন্ন্যাসীরা তাকে মিথ্যা চুরির অপরাধে ধরিয়ে দেয় এবং বিচারে তার আট বছর কারাদণ্ডহয়েছে। কি ভাবে ঠিক দাঙ্গা শুরু হল বলা মুস্কিল। তবে নিজ নিজ খাবার কাটবার জন্য তাদের জেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা ছুরি ব্যবহারের অনুমতি আছে। মনে হয় কে কার আগে নিজের খাদ্য কাটবে এই নিয়েই ঝামেলা শুরু হয়। অসহনীয় জীবন যাপন করতে করতে সবাই ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেছে। জেলে খাবার ব্যবস্থা নেই। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন যদি খাদ্য পাঠায়, তবেই আহার, নয়তো উপবাস। বহুদিন জেলে বাস করে অমানুষ হয়ে গেছে কয়েদীরা। কেউ খাচ্ছে, কেউ উপবাস

করছে, এ ঘটনা অসহনীয়। মাঝে মাঝেই দু'এক জন নিজেদের দ্বারাই খুন হয়। এ জন্য অপরাপর কয়েদীরাও নিঃসীম আতঙ্কে দিন যাপন করে। ফলে এই বিস্ফোরণ এবং সার্বিক দাঙ্গা। যাই হোক এ জন্যে তারা এখন প্রকৃতই দুঃখিত। লজ্জিততও।

—সারাদিন তোমরা কি কর ? মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

—কিছুই করি না।

—কোন রকম কাজ নেই তোমাদের ?

—না।

—কিন্তু একেবারে কাজ থাকবে না, একি কথা। এভাবে কি কোন পুরুষ মানুষ বাঁচতে পারে ? ঠিক আছে এ ব্যাপারে গভর্ণরের সঙ্গে আমি কথা বলব।

ঠিক এসময়েই মেয়েটি লক্ষ্য করলো যে সদল বলে গভর্ণর তার পেছনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। টানেলের অপর একটি গুপ্ত দরজা পথে তারা এসেছেন, ফলে গ্ল্যাডিস-এর সব কিছু কার্যকলাপ ও কথাবার্তা প্রত্যক্ষ করেছেন। গোলমাল সহসা স্তব্ধ হতে তারা সশরীরে এসে দেখা দিয়েছেন।

গভর্ণর নিচু হয়ে অভিবাদন করে গ্ল্যাডিসকে সকৃতজ্ঞচিত্তে বললেন, আপনার এই চমৎকার কাজের জন্য ম্যাডাম আমাদের অকৃতিম ধন্যবাদ গ্রহণ করুণ।

—এটা একটা অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার যে জেলের ভেতর এই সব মানুষগুলো সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর তালাবদ্ধ অবস্থায় বন্দী থাকে স্রেফ নিষ্কর্মা অবস্থায়। এদের করবার মত কোন কাজই নেই এখানে, তিক্ত কণ্ঠে গ্ল্যাডিস বলে গভর্ণরকে উদ্দেশ্য করে।

—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, গভর্ণরের বিহ্বলতা হাস্যকর মনে হল।

—দেখুন এভাবে কয়েদীদের অলস অবস্থায় রেখে দিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধবেই। সময় কাটাবার মত কোন কাজ নেই এদের। এদের লিপ্ত থাকবার মত কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিন অবিলম্বে। বছরের পর বছর অলস থাকতে দেবেন না। কোন একটা কিছু পেশায় নিযুক্ত করুন এদের।

গভর্ণরের বিহ্বলভাব তখনো কাটেনি, পেশা ? মানে ?

—এদের কাজ দেওয়া হোক। তাঁত সরবরাহ করুন, এদের দিয়ে বস্ত্র বোনান। আরো সব কুটির শিল্প বা কাজের ব্যবস্থা করুন, যাতে করে এরা কিছু রোজগার করতে পারে। সে অর্থ দিয়ে এরা তখন খাদ্য কিনতে পারবে, ফিরে পাবে আত্ম বিশ্বাস, আত্ম সম্মান বোধ।

এবার গভর্ণর মাথা নাড়লেন। তিনি এ ব্যাপারে রাজি না গররাজি বোঝা গেল না, বললেন, বেশ এ সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

—আমি এদের কথা দিয়েছি এ অপরাধ-তাদের মার্জনা করা হবে, প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

গভর্ণর সম্মতিতে মাথা নেড়ে বললেন, এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হলে অবশ্যই আমরা এদের এবারকার মত কিছু বলব না।

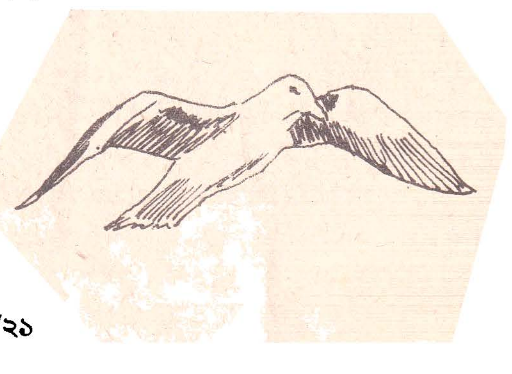
—ভেরি গুড। গ্ল্যাডিস এবার কয়েদী ফেং-কে বললে, আমি এখন যাচ্ছি। আবার আসব এবং তোমাদের সাহায্য করবার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাব। মা ভৈ।

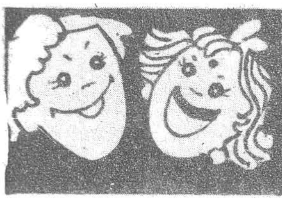
বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী কয়েদীর চোখে অসীম কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো, থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাডাম ধন্যবাদ আপনাকে আই-ওয়েহ-ডেহ।

মিশনারী মেয়ে গ্ল্যাডিস আই-ওয়েহ্-ডেহ্ এর অর্থ জানতো না।

বাড়ি ফিরে সে সন্ধ্যায় লু উং চেং-এর কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পেল, কথাটার মানে হল : 'পরম ধর্ম প্রানা'।

বাকি জীবন চীনে থাকাকালিন গ্ল্যাডিস প্রত্যেকের কাছে আই-ওয়েহ্-ডেহ্ রূপেই প্রখ্যাতি লাভ করেছিল।





হাসির হট্টমেলা

রসময়

বলত বুকু, তুমি যদি আলাদীনের মত একটা আশ্চর্য প্রদীপ পাও কি করবে ?

—কলকাতার শহীদ মিনারের মাথার ওপরে প্রদীপটাকে জ্বালিয়ে দিতাম। লোডশেডিং-এর হাত থেকে অন্ততঃ সবাই বাঁচত।

0

ডাক্তারবাবু আপনার হাতে নাকি রোগী তেমন টেকে না ?

—না··· আমি আবার ঝুলিয়ে রাখা পছন্দ করি না। হয় এসপার না হয় ওসপার। তবে ওসপারের যশটাই আমার বেশী, বুঝলেন ?

0

ডাক্তারবাবু ··· খুব কম পয়সার ওষুধ দেবেন, যাতে খেতেও ভাল, পয়সাও কম।

— তাহলে আপনি অক্সিজেন খান ভাল করে। ওটাতে পয়সাও লাগবে না। আর যা খাবি খাচ্ছেন তাতে ওটাই ভাল লাগবে।

0

বুকু ··· তোর কোন দিনগুলো ভাল লাগেরে বেশী। শীতের, বর্ষার না গরমের ?

—শীতের দিনে শীতকালটাই ভাল লাগে। বর্ষার দিনে বর্ষা। গরমের দিনে গরম আর বসন্তকালের হাওয়া।

একা একা বাইরে বের হবেনা বুকু। আজকাল ভীষণ ছেলেধরা বাজারে বেরিয়েছে।

— বিকেল বেলা তো আমি লেডিজ পার্কে খেলি। ওখানে ছেলেধরার ভয় কোথায় ?

0

বাসে এত জায়গা। তবু কেন দৌড়ে দৌড়ে সবাই উঠছে ?

— এশিয়ান গেমস দেখার পর সবাইর স্পিড্ বেড়ে গেছে। তাই সবাই এভাবে দৌড় ঝাঁপ দিচ্ছে।

0

ওরে ও বুকু কি সর্বনাশ, সবাই বলছে সিনেমা হল ভেঙ্গেছে।

—বাসে ভীড় হচ্ছে তাই। কেউ মারাটারা যায় নি তো আবার।

0

বুঝতে পারছি না এই রেল স্টেশনে নেমে কি দেখতে এসেছ বুকু ?

— দেখতে এলাম, এখানে রাজা কোথায় ভাত খায়। দেখছ না স্টেশনের নাম রাজা ভাত খাওয়া।

0

দ্যাখতো বুকু রাস্তার সব গাড়ীগুলোর আলো ঠিক জ্বলছে কিনা ?

— হ্যাঁ···সবগুলোর জ্বলছে। তবে হাসপাতালের আর দমকলের গাড়ীগুলোর আলো জ্বলছে আর নিভছে।



বালির ওপর পোল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ

পথিক পাঁচবার গাঁজায় দম দিলেন। পাঁচটা আগুনের গোলা আকাশের দিকে উঠে গেল। সন্ধ্যা শেষে রাত নেমে গেছে চারপাশে। সব কিছুই কেমন যেন ভৌতিক হয়েছে। ঝোপঝাড়, বড় গাছ, ছোট গাছ, টিলা, পাহাড়। সব কিছুই যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ওঁত পেতে বসে আছে। পথের পাশ থেকে মাঝে মাঝে একটা দুটো আলগা পাথর ছড় ছড় শব্দ করে ঢালু বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। শব্দে আমরা চমকে উঠছি। ভাবছি বাঘ বুঝি এসে গেল।

পথিক কল্কে ঠুকে গাঁজার আগুন পথের পাশে ফেলে দিলেন। বাতাসে আগুনের ফুলঝুরি খেলে গেল। পথিক তার ঝোলাটি আমাদের সামনে ফাঁক করে ধরে বললে, 'সব এর মধ্যে ফেলে দাও।'

কাকাবাবু বললেন, 'কী ফেলবো?'

'তোমাদের অহংকার, হিংসা, পাপচিন্তা, মনের মধ্যে যা যা ময়লা আছে, সব, সব ফেলে দাও এর মধ্যে।'

আমার মনে কিছু হিংসে ছিল, রাগ ছিল, লোভ ছিল, মনে মনে সব বিসর্জন দিলুম পথিকের তালিমারা ঝুলিতে। কাকাবাবু কী ফেললেন জানি না। তবে কিছু একটা ফেললেন। পথিক ঝোলা মুড়ে বললে, 'আর শের তোমাদের কিছু করতে পারবে না। শুধু শের কেন কেউ কিছু করতে পারবে না। নাও, এবার আমার সঙ্গে চলো।'

আমরা তিন জনে উঠে দাঁড়ালুম। দূর আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় জল হবে না কি? আজ কার মুখ দেখে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলুম কে জানে! আমি আয়নায় আমার মুখই দেখেছিলুম। চলতে চলতে পথিক জিজ্ঞেস করল, 'কী, এখন শরীরটা বেশ হাল্কা লাগছে না?'

'হ্যাঁ, বেশ হালকা লাগছে।' কাকাবাবু বললেন।

আমি অবশ্য তেমন কিছু বুঝছি না। কাকাবাবু সাধু–সন্তে, তুকতাকে ভীষণ বিশ্বাস রাখেন। জ্যোতিষচর্চা করেন। মাঝে মাঝে প্রেতচক্র বসান। গভীর রাতে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন ঘন্টার পর ঘন্টা। বলেন, অনেক নব অলৌকিক জিনিস দেখা যায়। গাছেরা নাকি ফিসফিস করে কথা বলে। জড়পদার্থেরা হেঁটে চলে বেড়ায়।

পথিক পিঠে ঝোলা নিয়ে সামনে নুয়ে পড়ে টুকটুক করে হেঁটে চলেছে। আমরা চলেছি পাশে পাশে। কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে জ্বালা অন্ধকার। বাতাসের সন সন শব্দ। বাঘের গর্জন থেমে গেছে। হয় তো শিকার পেয়েছে। সামনে ঝাঁকড়া মত বিশাল একটা গাছ। তলায় আলকাতরার মত অন্ধকার। ধক্ ধক্ করে দুটো আলো জ্বলছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কি রে বাবা?'

পথিক বললে, 'ডরো মাৎ? এই সেই শের।'

মট্ করে একটা শব্দ হল? কাকাবাবু বললেন, 'হাড় ভাঙার শব্দ। কি করব আমরা এগোব?' কাকাবাবুরও গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। আমার পা দুটো অবশ হয়ে আসছে।

পথিক জ্বলজ্বলে চোখ দুটো লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'তোমরা আমার পেছন দিয়ে আস্তে আস্তে গাছতলাটা পেরিয়ে চলে যাও, আমি আসছি।'

পথিক বাঘের খুব কাছে গিয়ে বললে, 'ক্যা মস্তান শিকার মিল গিয়া ?'

বাঘ উত্তরে একটা চাপা গর্জন ছাড়ল। দুবার ল্যাজ আছড়াল পটাপট্‌ শব্দে। আমরা যতটা সম্ভব দ্রুত গাছতলাটা পেরিয়ে গেলুম। আর একবার হাড়ভাঙার শব্দ হল। পথিক লাঠি ঠুক ঠুক করে এগিয়ে এল। কিছুই যেন হয়নি। যেন বড় একটা বেড়াল আদর করে এল। গুন্‌গুন্‌ করে সেই একই গান ঠোঁটে লেগে আছে।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর আমরা লোকালয়ে এসে পড়লুম। কিছু কিছু দোকানপাট রয়েছে। মিঠাইঅলা লাডডু পাকাচ্ছে। গরম কচুরি ভাজার গন্ধ আসছে নাকে। থাক থাক পেঁড়া সাজানো রয়েছে। বড় কড়ায় দুধ ফুটছে। পথিককে দেখে সেই বাজার মত জায়গায়টার সমস্ত মানুষ এক বাক্যে হই হই করে উঠল, 'আইয়ে মহারাজ আইয়ে।'

পথিক শুধু উদাত্ত গলায় বললে, 'জয় রাম জয় রাম।'

আমরা এত হেঁটেছি যে পা যেন আর চলছে না। মেঠাইঅলার দোকানের বাঁশের বেঞ্চিতে কাকাবাবু আর আমি থেসকে বসে পড়লুম। মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি। স্থানীয় লোকেরা পথিককে ছেঁকে ধরল। মহারাজের কী খাতির। কাঁচা শালপাতায় লাডডু আর প্যাঁড়া এসে গেল। খাঁটি ঘিয়ে কচুরি ভাজা হচ্ছে। কী তার গন্ধ ? বাঘের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে এখন পেটে চন চনে খিদে। ভেবেছিলুম, আমরা হয়তো বাদ পড়ে যাব ! না, এরা ভদ্রতা জানে। আমাদের জন্যেও খাবার এসে গেল।

মহারাজের কাছে নানা লোকের নানা বায়না। কারুর বোখার হয়েছে, কারুর পেটে দরদ। কারুর বাত। মহারাজ সকলকেই ওষুধ দিচ্ছেন। ওষুধ আর কিছুই নয় প্রসাদ। মুখ থেকে বের করে দিচ্ছেন কাউকে এক টুকরো প্যাঁড়া, কাউকে লাডডু। মুখে ফেলামাত্রই অসুখ সেরে যাচ্ছে। মহারাজের জয়ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিগ কেঁপে উঠছে। মেঠাইঅলা বেশ বড় তিন ভাঁড় দুধ পাঠিয়ে দিলেন। মোটা সর ভাসছে। কাকাবাবু ভীষণ খেতে ভালবাসেন। মুখ দেখে মনে হল ভীষণ খুশি হয়েছেন। চুমুকে-চুমুকে দুধটা মেরে দিয়ে, তিনিও জয়ধ্বনি দিলেন, জয় মহারাজের জয়।

কাকাবাবু বললেন, 'তুই সোজা বাড়ি চলে যা। আমি একটু সাধুসঙ্গ করে যাই। মহারাজের কাছে অনেক জিনিস। একটু সেবা করে দেখি। যদি কিছু পাওয়া যায়।'

'এই অন্ধকারে আমি একলা যাবো কি করে ?'

'কি যে বলিস ! এই তো একটু মাত্র পথ। সোজা গান গাইতে গাইতে চলে যা। ভয় কি ? পুরুষ মানুষের আবার ভয় কি ?'

শোনা গেল, মহারাজ আজ এখানেই রাত কাটাবেন। আর একটু পরেই দূর ওই গ্রামে রাম-লীলা হবে। মহারাজ সেই লীলা দেখবেন। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে দলে দলে হ্যাজাক লাইট চলেছে। কালো কালো ছায়া চলেছে সার বেঁধে, মেয়েপুরুষের দল। আকাশ ফুঁড়ে একটা বাজি উঠল। ফট্‌ করে ফেটে তারার ফুল ঝরতে লাগল। চারপাশ আলোয় আলো হয়ে গেল।

মেঠাইঅলার দোকানের পাশ থেকে অন্ধকারে কে যেন ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। প্রথমে ভেবেছিলাম সাপ। বাঘের হাত থেকে বেঁচে এইবার নাগের হাতে মৃত্যু। মেঠাইঅলা বললে, 'মহারাজ আমার বহু কাঁদছে।'

মহারাজ বললেন, 'আও বেটি ইধার আও।'

মহিলা মহারাজের পায়ের কাছে এসে বসলেন। মাসখানেক হল একমাত্র শিশুটি মারা গেছে। তাই ভীষণ দুঃখু। মহারাজ তার মাথায় হাত রাখতেই ফুলে ফুলে কান্না থেমে গেল। মহারাজ মৃদুস্বরে বললেন, 'জয় রামজী কি জয়।'



ছোটদের পাতা

Alphabet-এর কবিতা

বিশ্বজিৎ দেবনাথ

Arrow বান Betel পান
  Canal মানে খাল,
Die মরা Earth ধরা
  False হয় জাল।
Get আনা Hark শোনা
  Is কেবল হয়,
Jute পাট Knot গাঁট
  Label পরিচয়,
Mango আম Name নাম
  Ox বটে ষাঁড়,
Pitcher ঘড়া Quiver নড়া
  Ratio মানে হার।
Sorrow দুঃখ Tree বৃক্ষ
  Unpleasant আনন্দহীন,
Vein শিরা Wife দারা
  X-mas বড়দিন।
Yawn হাইতোলা Zoo পশুশালা
  হলো Letter শেষ,
ধৈর্য ধরে পড়ো একে
  না করিয়া ক্লেশ।

গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

চির বিদায়

সুমন রায় (বয়স ১৪)
(প্রথম)

কাল বৈশাখী। নামটা মনের মধ্যে এলেই গুমড়ে কেঁদে ওঠে সুশান্ত। বৈশাখ মাসের যেকোন দিনে প্রকৃতির রুদ্ররূপ দেখলে সুশান্ত অতীতের সেই বেদনাময় দিনটির মাঝে হারিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক বেদনাময় ঘটনার কথা।

আজ থেকে ১০ বছর আগেকার ঘটনা। সুশান্তর মনের এ্যালবামে সেদিনের সেই ঘটনা জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠ্ছে। আনন্দের সুরধারায় মাঝে বেদনার মূর্ছনা যে এত করুণ হতে পারে তা জানা ছিল না। সুখের স্মৃতি হারিয়ে ফেলা যায় সহজেই। বেদনার নয়। আজ সেই দিনটি, ১৭ই বৈশাখ। দশ বছর আগে এই দিনটিতে সকাল থেকে সারা বাড়ী জুড়ে সানাইয়ের সুর, খুশীর ফোয়ারা। সুশান্ত তখন ছোট। ছোটকার বিয়েতে তার আনন্দটাই ছিল সবচেয়ে বেশী। কারণ সে ছিল তখন নিতবর। ছোটকা বিয়ে করতে যাবে ··· বিরাট বজরা বোঝাই বরযাত্রীর দল হৈ চৈ করে আনন্দ করতে করতে চলেছিল ইছামতী নদীর ওপর দিয়ে। নির্মল সূর্যের কিরণে নদীর জল চক্ চক্ করছিল। বজরা ভেসে চলেছে দুলকি চালে। আর ঘন্টা-খানেক বাদেই অর্থাৎ সূর্য ডোবার আগেই কনের বাড়ী পৌঁছে যাবে ছোটকা। তারপর বিয়ে বাড়ীর ভোজ কাকে বলে···সুশান্ত রসগোল্লা খুব ভালবাসে। কম করে গোটা দশ পনের ···। কথাটা ভাবতে না ভাবতেই মাঝিদের একটা চীৎকার শোনা গেল। কি ব্যাপার? না ঈশান কোণে ঘন কালো মেঘ করেছে। কালবৈশাখীর তান্ডব হবার আশংকা আছে। ব্যাপারটা সুশান্ত না বুঝলেও বড়দের মুখ দেখে ভয় পেয়ে যায়। সামাল সামাল রব উঠতে

না উঠতেই ঘন কালো মেঘে আকাশটা ছেয়ে যায়। নদীর জল ফুলে ফেঁপে বজরাটিকে যেন রাগতেই নৌকার মত ওলট্ পালট্ করে দিতে চাইছে। আতংকে সবই যখন নীল ..তখনই বিরাট একটা কিছুতে ধাক্কা খেয়ে বজরাটা দাঁড়িয়ে যায়। তারপর কি হয়েছিল সুশান্তর মনে নেই। জ্ঞান ফিরল যখন তখন দেখে নদীর পাড়ে সারি সারি সব বরযাত্রীরা শুয়ে ওদের ঘিরে কত লোক। ছোটকা কোথায় ... ভাবতে না ভাবতে দেখে ছোটকাও ওদের সাথে শুয়ে। কি হয়েছে ওদের? কাকে প্রশ্ন করবে? সবাই কাঁদছে। শুধু কে যেন বলল — বিয়ে করতে এসে চির বিদায় নিল ... এ কেমন ভাগ্য।



মোহিতের স্বপ্ন

মোহিত শুয়ে শুয়ে দেখলো একজন মহিলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বিরাট তার চুল। মোহিত তার দিকে তাকাতেই সে মিষ্টি হেসে বললো, মোহিত, তোমার চোখে জল কেন?'

মোহিত জিজ্ঞাসা করলো, তোমার নাম কি?

—কাল বৈশাখী, বললো সে। কাল বৈশাখী? তাহলে তোমার জন্যেই তো আমার চোখে জল। তুমি বাংলার কী হাল করেছো। সংবাদপত্রখানা দেখো, তুমি ঠাকুরপুকুর নামে একটা জায়গায় গিয়ে কত লোককে মেরে ফেলেছো। সারাদিন ধরে তুমি কেবল ঝড় বহাও আর বৃষ্টি বাড়াও। সেই ঝড়বৃষ্টিতে কত লোকের প্রাণহানি ঘটে, কত বাড়ি ভেঙে যায়, কত লোকের যাতায়াত ব্যাহত হয়, কত লোকের রোজগার বন্ধ হয়। অভিমানের সুরে বলতে থাকে মোহিত, 'জানো, তুমি বৃষ্টি বাড়িয়েছিলে বলে বাবা একদিন অফিস যেতে পারে নি। সেইজন্য বাবাদের মাস্টারমশাই বাবাকে কত বকেছিলেন। আর সেদিন, সেদিন আমি কতদিন পর বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম, আর ঠিক সেই সময়, তুমি ঝড়বৃষ্টি বাড়িয়ে খেলাটা বন্ধ করে দিলে, যাও তোমার সাথে আমার আড়ি। ঠোঁট উল্টে বললো মোহিত।

'না, মোহিত সোনা, আমার উপর রাগ করো না। জানো আমার ভীষণ দুঃখ, আর সেই দুঃখেই তো আমি রোজ কাঁদি।' বললো কাল বৈশাখী। ঠিক আছে, আমি আর কাঁদবো না। তাহলে তুমি আমার উপর রাগ করবে না তো মোহিত? কাল বৈশাখী মিলিয়ে গেলো

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মোহিত দেখলো, দুদিন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার পর সূর্য উঠেছে আজ। গাছগুলোর জলের ফোঁটার উপর রোদ্দুর পড়ে সেগুলো ঝিক্ মিক্ করছে। সেই সঙ্গে সারা আকাশ যেন মোহিতের মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসছে। কালবৈশাখী মোহিতের কথা শুনেছে। মোহিতের মিষ্টি মুখ হাসিতে ভরে গেলো।

—সুদীপ্ত দাশগুপ্ত (১২ বৎসর)
(দ্বিতীয়)

'কালবৈশাখী' ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছ অনেকে। কিন্তু সবাই তো ভাল লেখনি। সেরা লেখা দুটো হয়েছে প্রথম, দ্বিতীয়। আর যারা ভালো লিখেছে তাদের নাম নিচে রইল:

বিশ্বজিৎ দেবনাথ, জয়পুর। দেবাশিস দেব, কাঁচরাপাড়া। সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, মধ্যমগ্রাম। দিপীকা দত্ত, উলুবেড়িয়া। বিপ্লব নাথ, মুর্শিদাবাদ। রণদেব গোস্বামী, কলকাতা-২৬। চৈতালী সরকার, হাওড়া। শ্যামলী বণিক, কলকাতা-৩৭। দেবাশিস বড়ুয়া, কলকাতা-২৮। আর বাকী যারা লেখা পাঠিয়েছ তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আজব কথা আজবভাবনা

অমিতাভ চৌধুরী

সকাল তখন আটটা ঘুমোচ্ছি। দেরিতে শুতে যাই, দেরিতে উঠি। শিয়রে থাকে টেলিফোন। হঠাৎ ক্রীং ক্রীং। কী ব্যাপার? লং ডিসট্যান্স কল। লস এঞ্জেলেসের বেভারলি হিলস থেকে এলিজাবেথ টেলর কথা বলতে চায়। তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি। ভেবেছিলাম বেশিক্ষণ কথা বলব না কিন্তু লিজারের সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা না বললে অভিমান করতে পারে। কিন্তু না, লিজা নিজেই দু-চারটে কথা বলে লাইন কেটে দিল। শুধু বলল, আমি যেন এক্ষুণি আমেরিকায় চলে আসি। ও ভীষণ বিপদে পড়েছে। এই দুঃসময়ে আমি ছাড়া আর কেইবা এগিয়ে আসবে। শেষদিকে ওঁর কথা ভাল বুঝতে পারছিলাম না। হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

ঘুমটুম উবে গেল। আমার ট্রাভেল সেক্রেটারিকে বললাম আমার নিজস্ব বোয়িংখানা রেডি করে রাখতে। আধঘন্টা পর ফ্লাই করব। টালিগঞ্জে আমার চৌধুরী প্যালেসের ছাদ থেকে হেলিকপটারে গেলাম দমদম। সেখান থেকে হংকং টোকিও হাওয়াই হয়ে লস এঞ্জেলেস। এয়ারপোর্টে এলিজাবেথ টেলর অপেক্ষা করছিল। আলুথালু বেশ। চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে তো পড়ছেই। কেঁদো না কেঁদো না বলে রুমাল দিয়ে চোখ নাক মুছে দিলাম। লিজা বলল, ভাইরে, আমায় বাঁচাও। চার্লি চ্যাপলিনের প্রেতাত্মা রোজ রাত্রে আমার শোবার ঘরে ঢুকে ভয় দেখাচ্ছে। বাড়ির পর বাড়ি পাল্টাচ্ছি, কিন্তু যেখানেই যাই, সেখানেই সেই —।

আমি, বললাম, চল, আগে তোমার বাড়ীতে যাই, তারপর সব শুনব। কিছু ভয় নেই, আমি যখন এসে গেছি একটা সুরাহা করবই। এলিজাবেথ বলল, বাড়ি কোথায়। প্রেতাত্মার ভয়ে আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনও গাড়িতে কখনও হেঁটে। গত তেষট্টি দিন ঘুম নেই। উফ্ পাগল হয়ে যাব।

আমি লস এঞ্জেলেসে এলে সানসেট বুলেভার্দে বরাবর যে হোটেলে উঠি, সেখানেই ওকে নিয়ে এলাম। তাপর ট্রাংক কল করলাম শ্রীরামপুরের এক নামকরা ওঝাকে। ইনি সাহেব ভূতের ব্যাপারে ওস্তাদ। ওকে বললাম শীগগীরি চলে আসতে। ইতিমধ্যে খবর দিলাম মার্গারেট থ্যাচার, প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এবং রিচার্ড অ্যাটেন বরোকে। ফিদেল কাস্ত্রোকেও জানাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তিনি তখন সজনে খালিতে ছুটি কাটাতে গেছেন। যাই হোক আমার ডাক পাওয়া মাত্র অ্যাটেনবরো, থ্যাচার ও সুহার্তো এসে গেলেন গোপনে। সব কথা বললাম। ওঁরা বললেন, আমেরিকায় কিছু হবে না। পাপুয়া আইল্যাণ্ডে এক ধরনের গাছ পাওয়া যায়— টেরাংটুটা তার নাম। সেই গাছের পাতার রসের সঙ্গে মকরধ্বজ খাওয়ালে ভূতের ভয় কমে যায়। থ্যাচার অবশ্য আরও পরামর্শ দিলেন, রাত্রিবেলা বুকে রূপার নথ ও কালো বোরখা পরে শুলে প্রেতাত্মারা ধারে কাছে ঘেঁসতে পারে না। ঘরে একটু গোবরজল ছিটিয়ে দিতে পারলে তো কথাই নেই।

থ্যাচার এবং অন্য দু'জন প্রেসক্রিপশন দিয়ে চলে গেলেন। আমি লিজাকে ঘুমোতে বললাম। ভয়ে ঘুম আসছে না দেখে আমি বাংলা ভাষায় একটি ঘুম পাড়ানি গান গাইতে শুরু করলাম ভীমপলশ্রী রাগে। লিজা ঘুমিয়ে পড়ল। আমার সুটকেশে সব সময় এক বোতল গোবর জল থাকে। সেই জল ছিটিয়ে দিলাম ঘরে এবং একটি নথ ও বোরখা কিনতে পাঠালাম আমার পারচেজ সেক্রেটারিকে। ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের সেই ওঝা এসে হাজির। সে ঘুমন্ত লিজাকে দেখে বলল, থ্যাচার দিদিমণি যা বলে গেলেন ঠিকই ওষুধ বাৎলেছেন। তবে শুকনো লঙ্কার গুড়ো নাকে গুঁজে দিতে হবে। আমি মন্ত্রপড়া লঙ্কা গুঁড়ো নিয়ে এসেছি। আপনার বন্ধু যদি একসঙ্গে ৯২৭টি হাঁচি দিতে পারেন, তাহলে কেল্লা ফতে। তখন

চার্লি চ্যাপলিন কেন, টুটেনসামেনের প্রেতাত্মা এলেও বাপ-বাপ বলে পালাবে।

এলিজাবেথ তখনও ঘুমে। আমি গোবর জলের বোতল খুলতে লাগলাম। ওঝা বের করল লঙ্কার গুঁড়ো এবং আমার পারচেজ সেক্রেটারি নিয়ে এল নথ ও বোরখা। তিনজনে মিলে যখন ভূতের দাওয়াই প্রয়োগ করতে যাব, এমন সময় হঠাৎ বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এলিজাবেথ খিল খিল করে হাসতে লাগল। আমরা অবাক। পাগল হয়ে গেল নাকি? কিন্তু না, পাগল নয়, লিজা স্বাভাবিক গলায় বলল, আমিও এইমাত্র চার্লিকে স্বপ্নে দেখলাম। উনি বললেন যে প্রেতাত্মা রোজ আসছিল আমার কাছে, সেটি ওর নয়, ওরই মতো দেখতে এক ঈজিপ্সিয়ান চাষীর। একথা শোনার পর ঘুমটা আরও গাঢ় হল, ভূতের ভয় চলে গেল এবং শরীরটাও সুস্থ মনে হচ্ছে। তারপরেই এক চাপড়ে লঙ্কার গুঁড়ো, গোবরজল, নথ ও বোরখা মাটিতে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে লিজা বলল, ভাবছি ওই ইজিপ্সিয়ান ভূতকেই আমি বিয়ে করব।

চার্ছড়া

শ্যামলকান্তি দাশ

১। পহেলগাঁয়ের তামাক, এবং
তামিলনাড়ুর আসল গম
কাটিহারের রামপিয়ারী
আনতে গেছে ত্রিবান্দ্রম।

২। কোথায় থাকেন হুয়েন সাং?
কোহিমা না টুয়েন সাং?
সাকিন কোথায়? পোস্টাপিস?
ঘনাদাকেই জবাব দিস।
কোথায় তেনার আসল ঘর?
ছত্রপুর না টিটলাগড়?
টিটলাগড়ে কী করেন?
শিবরামের বই পড়েন।

৩। নয় মস্কো নয় মিউনিখ
নটিংহামশায়ার
ছুটির দিনে ঘুরে এলেন
হরগোবিন্দ নায়ার।
মস্ত একটা ঘোড়ার ডিম
সেখান থেকে আনলেন
শিবের গান গাইতে গিয়ে
ঢেঁকিতে ধান ভানলেন।

৪। বলুন দেখি চাকরিটাকে
কীভাবে যায় বশ করা
মিথ্যে করেন মস্করা—
এলেন যখন জল খেয়ে যান
এবং দুটো রসকরা।



ছেলেধরা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বেকুব মিঞা আর ছোটু সিং দুই ছেলেধরা। এদের এখনই ছেলেধরা বলা উচিত হল কিনা বুঝতে পারছি না। কারণ ছেলেধরাদের মধ্যে নিয়ম অন্তত এক ডজন ছেলে না ধরলে কাউকে ছেলে-ধরা বলা দণ্ডনীয় অপরাধ। বেকুব মিঞা ও ছোটু সিং তো একটাও ছেলে ধরেনি এ পর্যন্ত। ধরবো ধরবো করছে।

এরা দুজন কলকাতার দুই মস্তান। বেকুব মিঞা বয়সে বড়। ছোটু বয়সে ছোট। বেকুবের কথা সেজন্য ছোটু মেনে চলে। মস্তানদের মধ্যে নিয়ম হল বড়র কথা ছোটকে মেনে চলতে হবে। নয়তো দলে থাকতে দেওয়া হবে না।

অনেকদিন পাড়ায় মস্তানি করার পর ছোটু বলল ঃ ওস্তাদ, আর তো পেট চলে না। একটা কিছু রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করতে হয়।

বেকুব বলল কী করবি বল। ব্যাংক ডাকাতি করবি, ছিনতাই করবি না সিঁধেল চুরি?

ছোটু বলল ঃ সব লাইনে অনেক লোক এসে গেছে। নতুন লাইন বাতলাও।

বেকুব বলল ঃ দি আইডিয়া। আয় আমরা ছেলে ধরি। ফটিকচাঁদ ছবিতে দেখেছি। ছেলে ধরতে খুব বেশি মেহনত নেই। একটা ট্যাকসি থাকলেই হল। আর ছেলেগুলো যা বোকা। একা একা পথে বেরোয়। যেন ধরা দেবার জন্যই তৈরি হয়ে বসে আছে। ওদের ধরো আর বাবা-মার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে ছেড়ে দাও।

ছোটু বলল ঃ মন্দ বলনি ওস্তাদ। তাহলে এখনই কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।

ওরা দুজন তখন চৌরঙ্গীতে ঘুরে বেড়াতে লাগল ছেলের খোঁজে।

বিকেল বেলা চৌরঙ্গী জমজমাট। কিন্তু সব ছেলেমেয়েই বাবা-মার সঙ্গে বেরিয়েছে। একা একা ছেলে পাওয়াই যায় না।

অনেকক্ষণ ধরে ওৎ পেতে থেকে একজনকে পাওয়া গেল।

হ্যাঁ, তারা যেমন চেয়েছিল তেমনি। বেশ

ফুটফুটে ছেলেটি। বছর বারো বয়স। পরনে স্কুলের পোশাক। কাঁধে ঝোলা। ছেলেটি একটি ম্যাগাজিনের স্টলে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল।

বেকুব কাছে গিয়ে বলল ঃ খোকাবাবু, সরবৎ খাবে ? খুব ভাল সরবৎ।

ছেলেটি বলল ঃ সরবৎ ? তা মন্দ নয়। তোমাদের বোধহয় সরবতের দোকান ?

আমার ভাইয়ের দোকান।

কোথায় ?

এইতো পাশে।

চল। আমার খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল।

ছেলেটি বেকুবের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে বেকুব বলল ঃ তোমার নাম কি ?

ঃ রবু। ভাল নাম রবীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ ?

ঃ তুমি চেন নাকি ? বেকুব বেশ অবাক হয়ে গেল। আমাদের বেলগাছিয়ায় ঠাকুর মশাইর দোকান আছে।

ঃ না না। সে ঠাকুর নয় — উনি একজন কবি।

বেকুব শুনে হতাশ হল। কবিদের সে চেনে না।

বেকুব, ছোটু ও রবু লাইট হাউসের সামনে সর–বতের দোকানে এলো।

রবু বলল ঃ সবচেয়ে ভাল ও বড় সরবতটা দেবে কিন্তু। ছোটকার সঙ্গে একদিন এসেছিলাম ছোট গেলাশ দিয়েছিল। আনারস আর লেবু মিশিয়ে দাও।

খেতে খেতে রবু বলল ঃ তোমরা কী করো ?

ঃ আমরা চাকরি বাকরি করি। আর ছোট ছেলেদের দেখলে বন্ধুত্ব করি। এই যেমন তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলাম।

ঃ তোমোদের বেশ ভাল লাগছে। তবে ওই রকম গোঁফ দাড়ি রেখেছ কেন ? ঠিক যেন মনে হচ্ছে তোমরা ছেলেধরা।

ওরা দুজনেই চমকে উঠল। তারপর বলল ঃ কে বলেছে আমরা ছেলেধরা ? ছেলেধরারা আরও ভয়ানক দেখতে হয়। তাদের ইয়া গালপাট্টা থাকে।

ঠিক মা দুর্গার অসুরের মত।

ঃ হ্যাঁ ওই রকম, ছোটু তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

দু গেলাশ সরবৎ খেয়ে রবু বলল ঃ সরবতই যখন খাওয়ালে তখন চলনা তোমাদের সঙ্গে একটু নিউ মারকেট ঘুরে আসি।

ঃ চলো।

তিনজনে নিউ মারকেট গেল। রবু বলল ঃ তোমরা তো আমার বন্ধু হয়ে গেলে তাই না ?

দুজনেই বলল ঃ জরুর।

ঃ তোমাদের কাছে টাকা আছে ?

কেন বলতো ?

না কিছু জিনিষপত্র কিনতাম।

দুজনে মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগল।

ঃ তোমাদের ঠিকানা দিয়ে দিও। বাবাকে বলব তোমাদের পাঠিয়ে দিতে।

ঃ না না, বন্ধুকে দেব ; এ টাকা আর নেব কেন ?

ঃ তাহলে চলো কিছু কিনি। আচ্ছা আগে চল বই কিনি কটা। তুমি টিনটিনের বই পড়েছ ?

না।

তুমি ?

না।

টারজন ?

বেকুব বলল ঃ সিনেমা দেখেছি।

আমিও দেখেছিলাম। খুব ছোটবেলায়। এখন ভাল করে মনে নেই।

বই-এর দোকানদার ওদের অভ্যর্থনা জানাল। তিনটি মোটা মোটা বই কিনল রবু। তিনশ চল্লিশ টাকা দাম।

বেকুবের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। কিন্তু সুদে আসলে সব টাকা তুলবে। প্রথমে তো একটু খরচ হবেই।

ঃ আর কিছু কিনবে খোকাবাবু ?

আর, দাঁড়াও, কিছু কারড কিনে নেই।

ওই যে পাঁচটাকা করে দাম যেগুলোর এক ডজন দিয়ে দাও।

কারড্ কেনা হল। রবু এবার বলল ঃ এক কাজ করলে হয় না। ওই ফুটবলটা যদি কিনি ?

ছোটু বলল ঃ ফুটবল কিনে খেলবে কোথায় ? ঘরের মধ্যে কি বল খেলা যাবে ?

না, আমাদের বাড়ির সামনেই মাঠ। আমার বলের শখ অনেকদিন থেকে।

ঃ তার চেয়ে অন্য কিছু কেন ?

ঃ তাহলে এই নরথ স্টার টি শারটটা কিনি।

ছোটুলাল এবার কাঁচু মাচু মুখ করে একশ টাকার নোট বার করে দিল।

ওরা এবার বেরিয়ে এল নিউ মারকেট থেকে।

বেকুবের ইচ্ছে এবার ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ট্যাকসিতে তোলে। তারপর ট্যাকসি নিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে সাত্রা-গাছি। ওখানে বাকী ব্যবস্থা আছে। একটা ঘরও ঠিক করা আছে।

এইবার চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেই ট্যাকসি করে।

ঃ এখনই বাড়ি যাবে ?

ঃ তা না হলে তোমার বাড়ির লোক ভাববে।

ঃ ও। তা চল।

এই ট্যাকসি —

ট্যাকসি এসে দাঁড়ালো।

ঃ তোমার বাড়ি কোথায় ?

ঃ এখুনি বাড়ি যাব না। চল কিছুক্ষণ ঘুরে যাই।

কোথায় ঘুরবে ?

কলকাতায় কত দেখার জিনিষ — কত ঘোরার জায়গা। গড়ের মাঠ, গঙ্গার ঘাট, চিড়িয়া-খানা, বেলুড় মঠ। আগে চিড়িয়াখানায় চল।

চিড়িয়াখানায় ঘন্টাখানেক কাটালো বেকুব ও ছোটু। ট্যাকসি বাইরে অপেক্ষা করছে। হাঁটতে হাঁটতে পা ভারি হয়ে আসছে। কিন্তু ছেলেটির কোথাও কোন ক্লান্তি নেই। জীবজন্তু দেখছে, হাত তালি দিচ্ছে। ছোটাছুটি করছে। এর মধ্যে আবার আইসক্রিম খেয়েছে। একঘন্টা পর বেরুল চিড়িয়াখানা থেকে।

এবার বল তোমার বাড়ি কোথায় ?

ঃ বারে এরমধ্যে বাড়ি যাবে কি ? চল না একটু গঙ্গায় নৌকায় করে বেড়াই।

বাড়ি যাবেনা ? তোমার বাড়ির লোক যদি কিছু মনে করে ?

ঃ করবে না। তুমি গঙ্গার ঘাটে যাবে কিনা।

না।

তাহলে তোমরা চলে যাও।

ইশ গেলেই হল। তোমাকে ছেড়ে যাব না।

তাহলে আমি যা বলব তাই করো।

কী ?

গঙ্গার ঘাটে।

ট্যাকসি চলল চাঁদপাল ঘাটে। পঞ্চাশ টাকা ভাড়া মিটিয়ে ট্যাকসি ছেড়ে দিল বেকুব। নৌকো চড়ার শখ হয়েছে ? বড়লোকের ছেলে। কি আর করবে ? আর শ খানেক খসাল। মুক্তিপণের অঙ্কটা বাড়িয়ে দিতে হবে। দশের জায়গায় পনের।

নৌকো থেকে যখন নামল তখন সন্ধ্যো হয়ে গেছে।

রবু বলল ঃ আচ্ছা ওই রেস্টুরেন্টে কোনদিন গেছ ?

না।

চল আজ যাই।

না, আজ দেরী হয়ে যাবে।

এখন তো সাতটা। আটটার মধ্যে ফিরলেই হবে।

ঃ তুমি বাড়িতে বলে আসোনি ?

ও নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না।

রেস্টুরেনটে ঢুকল। অরডার দিল চিকেন কাটলেট ও আইসক্রিমের।

ঃ বেকুব বলল ঃ একা একা এ ভাবে বেরিয়ে-ছিলে কেন ?

বেরুলে কি ?

কলকাতায় কত আজে বাজে লোক থাকে।
তারা আমায় কি করবে?
ধরে নিয়েওতো যেতে পারে।
ঈশ ধরলেই হল।
কেন, ধরলে কি করবে?
ঃ আমাকে ধরবেই না।
ঃ ধর আমরাই যদি ছেলেধরা হই।
ঃ তোমরা তা হতেই পারো না। তোমরা।
ঃ খুব ভাল লোক।
ঃ ভাল লোক? বেকুব মিশ্রা দাতমুখ খিচিয়ে ওঠে। দাঁড়াও তোমার মজা দেখাচ্ছি। এই ছোট্টু বিচ্ছুটাকে ধরতো। মুখ হাত বেধে ট্যাক্সিতে তোল।

রবু আরো জোরে হাসে।

হাসতে হাসতে বলে—সত্যি তোমরা দারুণ অভিনয়ও করতে পার। ভাল… ভাল। তোমাদের মতই বন্ধু আমার ভাল লাগে। এ্যাই তোমরা চলনা আমার বাড়ী। মা-বাবা তোমাদের দেখলে খুব খুশী হবে।

রবুর কথা শুনে বেকুব, ছোট্টু দুজনেই আরও রেগে যায়। ছেলেটি যে মহাবজ্জাত বুঝতে পারে। তবু কি ভেবে যেন বেকুব মিশ্রা বলে—যাব তবে বাড়ীর ভেতর নয় দূর থেকে তোর বাড়ী দেখব।

পথে যেতে যেতে বেকুব মিশ্রা প্ল্যান করে বাড়ীটা চিনে এলে সুবিধেই হবে। দূর থেকে বাড়ীটা চিনে নিজেই ছেলেটিকে জোর করে নিয়ে পালাতেই হবে।

দূরে অনেকগুলো বস্তির ঘরের দিকে আঙুল তুলে রবু বলে—ঐ যে ওই প্রথম ঘরটাই আমাদের। তোমরা দাড়াও আমি মাকে এক্ষুনি ডেকে আনছি।

ছোট্টু সিং রবুর হাতটা জোর করে ধরতেই রবু বলল—ঠিক্ আছে আমি মাকে ডাকছি… মা….মা…. ওমা বলে চেঁচাতে শুরু করে দেয়।

বস্তির ঘর থেকে সত্যি সত্যিই এক শীর্ণ মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখে বেকুব মিশ্রা আর ছোটু সিং রবুকে ছেড়ে পেছনে দে ছুট্। ওদের দৌড় দেখে রবু মনে মনে ভাবল— তাহলে কি সত্যিই ওরা ছেলেধরা?

ওসব কিছু নয়!

তুহিন শংকর চন্দ

রাত দুপুরে পাড়ার ভেতর
গাছগুলো সব নাচতে থাকে হঠাৎ
লোকে বলে ভূতের নাচন
কড়-কড়-কড় কড়াৎ।
টিনের চালে ঝম্ ঝমা ঝম্
বৃষ্টি শুরু হলে।
শুকনো চিলের তুবড়ী ছড়ায়
ভূতের ছেলে পিলে।
সকাল বেলায় ভূতগুলো সব
ফুলের বাগান হয়,
খুকু বলে — কাঁচ কলাটি—
ওসব কিছু নয়।





দিনাজ্ঞারার রহস্য

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

শিশির কুমার মজুমদার

পূর্ব প্রকাশিতের পর

মহিলার পিছন পিছন যে ঘরে এসে দাঁড়াল প্রশান্ত সেটা খাবার ঘর। ঘরের মাঝখানে বড় খানার টেবিল পাতা। তার চারদিকে চেয়ার সাজান। টেবিলের উপরে নিমক দানিতে নিমক, মরিচ দানিতে মরিচ। মাঝখানে কাঁচের পাত্রে কিছু ফল সাজান। একটা চেয়ারের সামনে ঝকঝকে প্লেট পাতা পাশে চামচ কাঁটা রাখা। সেই চেয়ার দেখিয়ে মহিলা প্রশান্তকে বসতে বললেন। প্রশান্ত বসতেই উনি পাশের দরজার দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন, 'গোবিন্দ, খাবার দিয়ে যাও।'

ধোপ দুরস্ত পোষাক পরা বাবুর্চি খাবারের প্লেট এনে সাজিয়ে দিল প্রশান্তর সামনে। মহিলা ঠিক ওর সামনের চেয়ারখানা টেনে বসলেন, বললেন, 'যে ক'দিন তুই এখানে থাকিস, আমাকে না হয় রাক্ষুসী মা বলেই ডাকিস বাবা। মা তো আর তোর হতে পারলাম না। রাক্ষুসী মা–ই না হয় হই।'

একথা শুনে ভীষণ লজ্জা পেল প্রশান্ত। বলল, 'না না, তা কেন, আমি নয় আপনাকে মাসীমা বলেই ডাকব।'

'না বাবা।' বললেন মহিলা, 'তোর মুখে মা ডাক শুনতে বড় ইচ্ছা করছে আমার। মা বলে তো ডাকবি না। রাক্ষুসী মা বলেই ডাকিস। তাতেই মন ভরে যাবে আমার।'

গলার স্বর কেন যেন ভারী হয়ে গেল ওর। অবাক প্রশান্ত দেখল, ওর চোখের কোণে জল টল টল করছে। দু'ফোঁটা তার গড়িয়ে পড়ল! তিনি তা মুছতেও চেষ্টা করলেন না।

থাকতে না পেরে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি, আপনি কাঁদছেন! কেন? কি হয়েছে?

কাঁদছি আমি তো সারা জীবন ধরে বাবা। জানি না সে কান্নার শেষ হবে কি না কোনও দিন। বললেন মহিলা, 'যে কটা দিন তুই এখানে থাকিস, তুই আর আমাকে কাঁদাসনে শন্তু। সে ক'টা দিন আমাকে একটু হাসতে দিস। তোর রাক্ষুসী মা-র বড় দুঃখ রে।'

'কিন্তু রাক্ষুসী মা বলে বুঝি কাউকে ডাকা যায়? বলল প্রশান্ত, 'ও আমি পারব না। আমি মাসীমাই বলব।'

'তাহলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব শন্তু।' বললেন মহিলা, 'আমাকে আর কাঁদাসনে।'

থতমত খেয়ে গেল প্রশান্ত। কি যে বলবে তা আর ভেবে পেল না। দেখল ওর চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে। তা দেখে মনটা আপনা থেকেই কেমন যেন হয়ে গেল প্রশান্তর। কেন যেন মনে হল, এই মহিলাও বোধহয় ওরই মত একজন বন্দী! কিন্তু তা যদি হবে তো ওই লোকটা কে? আর বন্দীই যদি হবেন তো এমন ছাড়াই বা থাকবেন

কেন ? তার হুকুমে বাবুর্চি কাজ করবে কেন খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফওয়ালা লোকটা ঠিকই বলেছে সব কিছু যেন কেমন ভীষণ জট পাকান। এ জট কি তাড়াতাড়ি খুলবে না। নইলে তো কিছুই বোঝা যাবে না।

এক রাজকন্যার রূপকথা

হঠাৎ প্রশান্তর মনে হল, উনি যেন কি ওকে শোনাবেন বলেছিলেন। সে কথাই ওকে মনে করিয়ে দেবে বলে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, উনি নিজেই চোখের জল মুছে ফেলেছেন। ওর দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, 'যেতে যেতে এখন আমার কিছু কথা শোন তো। আগে শোন, পরে যা জিজ্ঞাসা করার করবি। সব কথাই আজ তোকে আমি খুলে বলব। কিন্তু কি করে যে আরম্ভ করি···', একটু থামলেন উনি। একটু যেন ভাবলেন। বললেন, 'এ এক অবিশ্বাস্য কথা। এক রাজকন্যা ছিল, হ্যাঁ, রাজ কন্যাই বলা চলে তাকে। বাবা মার এক মাত্র মেয়ে অনেক তাদের টাকা পয়সা। দেশে বিশাল রাজবাড়ি অনেক জায়গা জমি। সে সব জমিতে অনেক পাহাড় বন জঙ্গল। সেই পাহাড়ে অনেক খনিজ পদার্থের আকর। রাজকন্যার বিয়ে হল এক মাইনিং ইনজিনিয়ারের সঙ্গে। বাবাই দেখেশুনে বিয়ে দিলেন, কারণ জামাই তাদের লেখাপড়ায় খুব ভাল। রাজ কন্যার বাবার ইচ্ছা জামাই তাদের কোম্পানী খুলে ধাতু আকরের খাদান বানায়। কোম্পানী হল, খাদান চালু হল। জামাইয়ের চেষ্টায় দেখতে দেখতে চারদিকের পাহাড়ে অনেক গুলো নানান ধাতু আকরের খাদান চালু হয়ে গেল। অফিসের কাজকর্ম দেখতেন রাজ কন্যার বাবা, আর খাদানের কাজ দেখত জামাই। সব কিছু বেশ সুন্দর ভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ রাজকন্যার মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অল্প কিছুদিন রোগ ভোগ করে তিনি চলে গেলেন। এতে রাজ কন্যার বাবার মনের পরিবর্তন হল। তিনি কোম্পানীর কাজ থেকে ছুটি চাইলেন। দেশ বিদেশে তীর্থ দর্শন করবেন বলে। জামাইয়ের ছোট ভগ্নিপতি খুবই ভাল মানুষ। নানান ব্যবসায় নানা ভাবে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে তখন চুপচাপ বসে ছিলেন। জামাই তাঁকেই ডেকে এনে কোম্পানীর কাজ বুঝে নিতে বললেন। তিনিও মহা উৎসাহে কাজে যোগ দিলেন। রাজ কন্যার এক আপন মাসতুতো ভাই ছিল। সেও তখন একে বারে বেকার। লেখাপড়ায় সে তেমন ভাল ছিল না। তাই চাকরি বাকরিও যোগাড় করতে পারছিল না। তাকেও কোম্পানীতে নেওয়া হল। জামাইয়ের ভগ্নিপতি, আর রাজ কন্যার ভাই দুজনেই মহা উৎসাহে কোম্পানীর কাজে লেগে পড়লেন। রাজকন্যার বাবা ছুটি নিয়ে বেনারসে তীর্থ করতে চলে গেলেন। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তিনিও বিদায় নিলেন। কোম্পনীর সব দায় দায়িত্ব তখনি চাপল ভগ্নিপতি আর ভাইয়ের হাতে।

জামাই বছরের বেশী সময় জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন খাদানের কাজে। কোম্পানীর কাজকর্ম দেখার তাঁর তেমন সময় ছিল না। তাছাড়া আপন–জনদের হাতে সব ভার থাকতে তিনি নিশ্চিন্তও ছিলেন। কিছুদিন ব্যবসা বেশ ভালই চলল। তার-পরই নানান দিকে নানান গোলমাল দেখা দিল। সে সব গোলমাল টাকা পয়সা, পাওনা গণ্ডা নিয়েই। খনির যন্ত্রপাতি যে কোম্পানী যোগান দিত তারা অনেক টাকা পাওনা বলে মামলা করল। অন্য আর আর সব যোগানদারেরাও তা দেখে মামলা সুরু করল। অথচ খনিতে প্রচুর কাজ হয়েছে। সমস্ত আকরও বিক্রী হয়ে গেছে। তা বেচে লাভ ছাড়া লোকশান তো হওয়া উচিত নয়। ব্যাপার কি হয়েছে দেখার জন্য খাদানের কাজ ছেড়ে জামাই এসে বসলেন অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন, লাখ লাখ টাকা তছ-রূপ হয়েছে নানান ফন্দি ফিকির খাটিয়ে। আর প্রতিটি নষ্টামির সঙ্গে যুক্ত তাঁর আপন ভগ্নিপতি। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করলে তাঁকে বহু বছর জেল খাটতে হবে ঠক জোচ্চর হিসাবে। অথচ তিনি এসবের কিছুই জানেন না। জানেন না, সত্যিই। রাজ কন্যার ভাই তাঁর ভাল মানুষির সুযোগে সব কিছু করেছে। কাগজ পত্র দেখলে তা অবশ্য কখনই প্রমাণ করা যাবে না।

ভগ্নিপতির চাকরি গেল। ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোথাও প্রমাণ না থাকাতে তার চাকরি গেল না বটে, তাকে সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কোম্পা-নীর সব কাজ বুঝে নিলেন জমিদারির নায়েব মশাই।

তারই পরামর্শে কারও বিরুদ্ধে মামলা করা হল না। জমিদারির আয় থেকে সবার ধার শোধ করা হল। আবার আস্তে আস্তে খাদানের কাজ চালু হল। সব কাজের ফাঁকে লোক লাগিয়ে নায়েব মশাই খোঁজ খবর করে দেখলেন, ছোট ভগ্নিপতির অবস্থা আগে যেমন ছিল তেমনি আছে। অথচ রাজকন্যার ভাই নামে বেনামে বাড়ি গাড়ি সম্পত্তি কিনে তার অবস্থা একদম ফিরিয়ে ফেলেছে। সে এত টাকা পেল কোথা থেকে তার কোনও হদিস নেই। রাজকন্যা তখন একটা ভুল করে বসল, সে তার ভাইকে এই গোপন খোঁজ খবরের কথা জানান, জিজ্ঞাসা করল, এত টাকা সে পেল কোথা থেকে। উত্তরে ভাই বলল, ওসব তার পৈত্রিক সম্পত্তি বেঁচে করেছে। কিছু করেছে নিজের টাকা জমিয়ে। রাজকন্যা তো তার অবস্থার কথা জানত। মেসমশাই ছিলেন নামী স্কুলের হেডমাস্টার। অবস্থা তাঁদের ভাল হলেও এত টাকা তাঁদের ছিল না। সে কথাই সে ভাইকে বলল। বলল, কোম্পানীর টাকা কে যে চুরি করেছে, তা আর কারও জানতে বাকী নেই। একথা শুনে তার ভাই তো স্পষ্ট বলেই বসল, সে-ই আদালতে যাবে কোম্পানীর ব্যাপারে। কাগজ পত্র আটকে প্রমাণ করবে কে চোর কে সাধু।

কাজটা রাজকন্যা ভাল করেনি। ভগ্নিপতি এসে বললেন, এর ফলে তাকেই জেলে যেতে হবে। কারণ কাগজে কলমে তিনিই দায়ী। আর যখন আদিত্য, রাজ কন্যার ভাই, বুঝতে পেরেছে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তখন আদালতে গিয়ে সব ব্যাপারটার তাড়াতাড়ি ফয়সলা করবে।

সব কিছু আবার জট পাকিয়ে গেল। ভগ্নিপতি কলকাতায় চলে যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু এর পর আর গেলেন না, কারণ লোকে তাহলে বলবে তিনি পালিয়েছেন। কারণ এর মধ্যে কানাঘুষায় সব কথাই প্রায় সবার জানা হয়ে গেছে। আর এই প্রচারে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছে ওই আদিত্যই

নিরুপায়, রাজকন্যা একদিন তার মাসীর কাছে গেল অন্তত আদিত্য যাতে মামলা না করে তাই বোঝাতে। মাসী তার কথাতো শুনল না-ই, তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ছেলের সর্বনাশ করার যে চেষ্টা ওরা করছে, তা তিনি জানেন। তাই নামী কজন আইনজ্ঞের সাহায্য তারা নিয়েছেন। তারই মামলা চালু করবেন কদিনের মধ্যে।

এমন যখন অবস্থা নায়েব মশাই এক নতুন চাল চাললেন। তিনি আদিত্যকে ডেকে বললেন, খাদান কোম্পানী বেঁচে দেওয়া হবে, ও যদি তা কিনে নিতে চায় তো নিতে পারে, সর্ত একটাই ও কারও নামে কোন রকম মামলা করতে পারবে না।

আদিত্যের লোভ তখন আকাশ ছোঁওয়া। ও রাজী হয়ে গেল। ও এক এক অংশে ক্রমে ক্রমে গোটা খাদানটা কিনে নেবে। প্রথমেই কিনবে এক নম্বর খাদান।

নোংরামীতে ও যতই পাকা হোক না কেন খাদানের কোন কিছুই ও বুঝত না। এটা ঠিক, কোম্পানীর এক নম্বর খাদানেই সব থেকে বেশী কাজ হত। কিন্তু ওকে কাজ কর্ম থেকে সরিয়ে দেবার পর, হঠাৎ কোনও কারণে ও খাদানের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ও খাদানে আর কখনও কেউ কাজ করতেও পারবে না। বোকা আদিত্য ওটাই কিনবে বলে তৈরী হল।

কিন্তু তখনি হঠাৎ ও কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ব্যাপারটা এতই অদ্ভুত যে কেউ কিছুই বুঝতে পারল না। ভগ্নিপতিই লোকজন লাগিয়ে চারদিকে খোঁজ খবর করলেন। কিন্তু কোথাও তার খবর পাওয়া গেল না। সবাই ভাবল। চুরি ধরা পড়াতেই লজ্জায় সে গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু তাহলে তো সে তার আপন জনদের সঙ্গে অন্তত গোপনে যোগাযোগ রাখত। তার মা বাবা তো প্রায় পাগলের মত হয়ে পড়লেন। একদিন রাজ কন্যার কাছে এসে কেঁদে পড়লেন। বললেন, ধার দেনা করে কোম্পানীর সব ধার তারাই শোধ করে দেবেন, তাদের ছেলেকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে তা ওদের বলে দিতে।

কদিন পরে তারাই থানায় ডাইরী করলেন, ছেলেকে তাঁদের গুম খুন করা হয়েছে বলে। কারণ কোম্পানীর লাখ লাখ টাকা তছরূপ করে, সে দায় তারা ওরই ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল। ছেলে হিসাবের কারচুপি ধরতে পারাতে তাকে গুমফু করা হয়েছে।

রাজ কন্যার বাড়িতে পুলিশ এল। কোম্পানীর কাগজ পত্র সব ধরে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু তাতে এ

অভিযোগ টিকল না। টিকবে কি করে, আদিত্য মামলার ভয় দেখাতেই নায়েব মশাই আসল নথি পত্র সব নষ্ট করে নতুন করে তৈরী করে রেখেছিলেন যে।

কিন্তু গুম খুনের ব্যাপারটা রয়ে গেল। শেষে একদিন রাতে পুলিশ এসে রাজকন্যা আর তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা আদিত্যকে গুম খুন করেছে।

কোর্টে মামলা উঠল। পুলিশ প্রমাণ হিসাবে কিছু ছাই আর পোড়া হাড়ের টুকরো হাজির করল যা নাকি মানুষের হাড় বলে প্রমাণ হয়েছে। ও ছাই ওরা জঙ্গলের ধারের এক চিতা থেকে তুলে এনেছে, যেখানে মৃত আদিত্যকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই চিতার ধারে তারা একটা সোনার আংটিও কুড়িয়ে পেয়েছে যাতে মিনা করে 'এ' অক্ষর লেখা। আদিত্যের বাবা মা সে আংটি আদিত্যের বলেই শনাক্ত করেছেন।

শুধু এই নয় একদল মানুষকেও তারা হাজির করল, যারা হলপ করে বলল, রাজার বাড়ির গুম ঘর থেকে তারা আদিত্যর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এটা তারা করেছে জামাই রাজার হুকুমে। গুম ঘরে রক্ত পাওয়া গেছে তাও নাকি মানুষের রক্ত। গুম ঘর থেকে জঙ্গলে যাবার গোপন পথেও যে রক্ত পাওয়া গেছে, তাও মানুষের রক্ত।

এর পর রাজ প্রাসাদে কাজ করে এমন কজন হলপ করে।

সাক্ষী দিল, তারা রাজকন্যা আর জামাই রাজা আদিত্যের সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখেছে, তাতে নাকি জামাই রাজা আর রাজকন্যা দুজনেই আদিত্যকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখান হয়েছিল। তার পরই নাকি আদিত্যকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রাজকন্যার পক্ষের উকিল বললেন, চিতার আগুনে পুড়লে আংটি কখনও আস্ত থাকে না। উত্তরে শোনা গেল যারা মৃত দেহ জ্বালিয়েছিল, তারা মৃত দেহ থেকে আংটি খুলে নিয়েছিল নিজেরা ভাগ করে নেবে বলে। কিন্তু বখরা নিয়ে গোলমাল হওয়াতে ওটা ওরা চিতার পাশে ফেলেই চলে যায়। রাজকন্যার পক্ষের উকিল বললেন, গুম ঘরের রক্ত, বা চিতার ছাইয়ে পাওয়া হাড়ের টুকরো যে ঠিক আদিত্যর সে প্রমাণ নেই। তাতে সাক্ষীরা হলপ করে বলল, মৃত দেহ যেখান থেকে তারা তুলেছিল রক্ত ঠিক সেখানেই পরেছিল। আর যে চিতায় তারা দেহ পোড়ায় হাড়ের টুকরো ও সেখান থেকেই তোলা হয়েছে।

বহুদিন ধরে এ মামলা চলল, শেষে রায় বার হল, রাজকন্যা আর জামাই রাজার যাবজ্জীবন জেল। আদিত্যকে ঠিক খুন করতে কেউ দেখেনি বলেই ফাঁসিটা আর হল না তাদের। বড় আদালত ও এই রায় বাহল রাখল। সারা জীবনের মত দুজনে জেলে চলে গেল। এক একটা করে চোদ্দটা বছর কেটে গেল। জেলে ভাল ভাবে থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত দুজনেই আবার ছাড়া পেল। ছাড়া পেয়েছে তারা এই মাত্র কটা দিন আগে। ছাড়া পেয়েই তারা সোজা চলে এল তাদের দেশে। পুরনো নায়েব মশাই এত দিন তাদের সব দেখা শুনা করেছেন। এমন কি খাদানের কাজও ভাল ভাবেই চালিয়ে এসেছেন। রাজকন্যা



আর জামাই [illegible] নেই। কিন্তু [illegible] কোনও কিছুই [illegible] পাওয়াতে গোটা [illegible] মধ্য চির কালের মত [illegible] বিশ্বাস করবে তাদের কথা ? [illegible] তারা তাদের আপনজনের কাছে [illegible] দূরের মানুষ হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবীটাই [illegible] কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

থামলেন উনি [illegible] কি যেন ভাবতে লাগলেন।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কি হল ?'

'তারপর যে কি হবে তা কে জানে রে।' বললেন মহিলা

'আপনিই কি সেই রাজকন্যা ?' জিজ্ঞাসা করল প্রশান্ত।

চমকে উনি ফিরে তাকালেন। কথা শুনে। করুণ ভাবে হাসলেন। বললেন, 'অথচ মজা কি জানিস যাকে খুন করা নিয়ে এত কাণ্ড, তাকে কিন্তু তারপর থেকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। চোদ্দটা বছর জেলে বসে দুজনেই ভেবেছিল, আদিত্য হঠাৎ ফিরে এসে সব গোলমাল মিটিয়ে দেবে। প্রমাণ করে দেবে সে খুন হয়নি। কিন্তু তা আর হয়নি। কে জানে কি হয়েছে তার। আজ চোদ্দ বছর পরে সেই রাজকন্যা আর জামাই রাজা দুজনেই এখন জানতে চায়, সত্যি কি হয়েছে আদিত্যর। কারা এমন করে মিথ্যা মামলা সাজাল, যারা মিথ্যা সাক্ষী দিল, তারা কেন তা করল। কে আসলে দায়ী সব কিছুর জন্য। এসব খোঁজ করে যদি প্রমাণ করা যায় আদিত্য খুন হয়নি। তাহলে জীবনের চোদ্দটা বছর জেলে পচে মরলেও বাকী জীবন তারা দুজনেই সুখে সম্মানে থাকতে পারবে। সে কাজে সাহায্য করার জন্য তোকে এখানে [illegible]। বল, তুই এ কাজে সাহায্য করবি না ?'

প্রশান্ত অবাক [illegible] তো বুঝলাম। কিন্তু এর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ! আমাকে কেন অজ্ঞান করে বন্দী করে [illegible] ? [illegible] কি সাহায্য করব ?

'আমরা তোকে য [illegible]।' বললেন মহিলা, 'আর সম্পর্কের কথা যদি বলিস তো বলব, তা জানতে পারবি সব শেষে।'

'তুমি সেই রাজকন্যা।' বলল প্রশান্ত, 'কিন্তু ও লোকটা কে ? ও-ই কি সেই জামাই রাজা ? বেশ তো নয় হল, তা হলেও আমি কি করে তোমাদের সাহায্য করব ?'

এ কথার মহিলা কোনও উত্তর দেবার আগেই ঘরে ঢুকল সেই লোকটা। হাতে তার একটা কাগজ। তাতে কি যেন সব লেখা। এগিয়ে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হল তোমার খাওয়া শস্ত ? এসো তো এই চিঠিটা লিখে দেবে। আজই রাতের গাড়িতে ওটা দিয়ে লোক পাঠাবে কলকাতায়। এস আমার সঙ্গে।

— ৬ —

রহস্যময় এক চিঠি

নিজের কথা প্রায় ভুলেই গেছিল প্রশান্ত। ভুলে গেছিল ও এখানে বন্দী। আর ওকে বন্দী করে এনেছে এই লোকটা। ওর ডাকে আবার হুঁস ফিরে পেল প্রশান্ত। এ কি অদ্ভুত এক জট পাকান অবস্থা ! চারদিকের সব কিছুই ওর কেমন যেন রহস্যে ঢাকা ! কিছু তার বোঝা গেলেও, শেষ পর্যন্ত কিছুই মিলছে না। রাক্ষুসী মা ওকে এক অদ্ভুত রূপকথা শুনিয়েছেন। এখন এর শেষে যে কি আছে তা ওর জানতে ইচ্ছা করছে। কি হল আদিত্যর ? সে কি খুন হয়েছে ? কে খুন করল তাকে ? তা না হলে তার কি হল ? এই লোকটাই বা এখন কি করতে চায় ? আর কেন এসবের মধ্যে ও নিজে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ল ? রহস্য, রহস্য, সব গভীর রহস্যে ভরা !

লোকটার পিছন পিছন ওরা সকলে বারান্দা পার হয়ে অন্য দিকের একটা ঘরে ঢুকল। সে ঘরটা লাইব্রেরী ঘর বা পড়ার ঘর। দেওয়াল জোড়া চার–দিকে তার আলমারি বইয়ে ঠাসা। মাঝখানে চেয়ার টেবিল পাতা। তারই একটা দেখিয়ে প্রশান্তকে বসতে বলল লোকটা। নিজেও বসে হাতের কাগজটা প্রশান্তর সামনে মেলে রাখল। প্রশান্ত ঝুঁকে দেখল তাতে লেখা আছে,—'আমি এখানে এসেছি। সব কিছু দেখে শুনে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে সব বুঝতে



পেরেছি। ছিঃ ছিঃ। প্রশান্ত রায় চৌধুরী।'

অবাক প্রশান্ত বলল, 'এ চিঠির মানে?'

'ও তোমাকে বুঝতে হবে না শন্তু। বলল লোকটা, 'তুমি শুধু অন্য কাগজে লিখে সই করে দাও। তাতেই হবে।

'না, এ চিঠি আমি লিখব না।' বলল প্রশান্ত, 'এর মানে কি, তা আগে বলতে হবে।'

লোকটা থমকে গিয়ে বলল, 'তোমার রাক্ষুসী মা কি তোমাকে বলেনি, সব মানে তুমি হয়ত জানতে পারবে অনেক পরে। তার আগে মানে যে কি তা হয়ত আমরাই ঠিক জানি না।'

রাক্ষুসী মা বললেন, 'এখন তো ওকে কিছুই বলা যাবে না। বলা উচিত ও হবে না। গল্পটা ও শুনেছে। ও চিঠি ও সই করবে কেন?'

একথা শুনে কি যেন ভাবল লোকটা কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'গুম করে বন্দী করে এনে গুণ্ডারা সবাইকে দিয়ে জোড় জবরদস্তী সব কাজ করিয়ে নেয়। আমিতো করিনি। কেন করিনি, তা কি তুমি বোঝ না শন্তু? করিনি, কারণ আমরা তোমাকে এত টুকুও দুঃখ ব্যথা দিতে চাই না। তবুও কেন তোমাকে এমন করে বন্দী করে রেখেছি? তারও নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আর সে কারণের একটা হল, তোমাকে দিয়ে এই চিঠিটা লেখান। না যদি তুমি লেখ তো আর কি করব? বুঝব যা করতে চাই তা আর হবে না। যে অন্ধকার চারদিকে, তা তেমনই থেকে যাবে। না, না শন্তু, এ ভুল তুমি কর না। এতে যে কি ভীষণ ক্ষতি হবে তা তুমি জান না। লক্ষ্মীটি, চিঠিটা লিখে দাও। দাও।'

লোকটার গলায় যেন আকুতি। মনটা নরম হয়ে গেল প্রশান্তর। বলল, 'অমন একটা বিদঘুটে চিঠি লিখে দিলে তোমাদের যে কি লাভ হবে কে জানে। কথা দাও ওই চিঠি দিয়ে আর কারও কোন ক্ষতি করবে না। তবে লিখব।'

'যে ক্ষতি আমাদের হয়ে গিয়েছে তার থেকে বেশি ক্ষতি আমরা কার করতে পারব শন্তু। আমরা শুধু সত্যি যা তা জানতে চাই।' বলল লোকটা।

একটা সাদা কাগজে অমন অদ্ভুত চিঠিটা লিখে দিল প্রশান্ত। শেষে জিজ্ঞাসা করল, 'কার চিঠি এটা? কার নাম লিখব?

কাগজটা হাতে নিয়ে লোকটা বলল, 'তা আর তোমাকে লিখতে হবে না শন্তু। বাকী যা, তা আমি লিখে দেব। যাও তুমি এখন একটু বাগানে বেড়িয়ে এসো। নয়ত ছাদে যাও। এ বাড়িটাও অনেক পুরণো। বাড়ির মধ্যেও অনেক কিছু দেখার আছে। যাও তোমার নতুন মার সঙ্গে তা ঘুরে দেখ গিয়ে। আমি এখন একটু একলা থাকতে চাই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত বলল, আমার জেঠু খুব ভাবছেন। তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখতে দেবে?

'দেব'। না ভেবেই বলল লোকটা, 'কাল লিখো। স্টেশনে গাড়ি গিয়েছে তাঁকে আনতে। আজ যদি না আসেন তিনি তো কাল লিখো।'

'জেঠু আসবে আজ এখানে?' অবাক প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ আমি তো তাই জানছি।' বলল লোকটা।

'তাঁকেও তোমরা বন্দী করে আনবে?' ঈষৎ রাগে জিজ্ঞাসা করল শন্তু।

লোকটা মুখ তুলে তাকাল। বলল তিনি ট্রেনে আসবেন, নিজে। ট্রেন কাউকে বন্দী করে আনা যায় না। যাও, এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

নানান চিন্তা এসে মাথার মধ্যে ভীড় করে এল প্রশান্তর। এঁদের যত ভাল বলে ও মনে করছিল, এরা তত ভাল নয়।

কি ফাঁদ পেতেছে এরা কে জানে, সে ফাঁদে ধরা পড়েছেন জেঠু। নইলে তিনি কেন স্বেচ্ছায় এই শত্রুপুরীতে ধরা দিতে আসবেন।

রাক্ষুসী মা বললেন, 'শন্তু তোকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দি। দেখবি আয়, কত কি দেখার আছে।'

— ৭ —

নাম রহস্যভেদ

কোন কথা আর না বলে প্রশান্ত মহিলার পিছন পিছন এগোলো। লোকটা তখন টেবিলে বসে কিসব যেন লিখছিল। ঘর থেকে বার হয়ে ওরা দোতলার সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। রাক্ষুসী মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এ বাড়িতে এক সময়ে কত আনন্দের স্রোত বইত। আর আজ! চারদিকে শুধু দুঃখ আর হতাশা। আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসে মাঝে মাঝে।'

প্রশান্ত এসব কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, লোকটাই আমাকে জোর করে এখানে ধরে এনেছে। আজ আবার একটা অদ্ভুত চিঠি লিখিয়ে নিল।

ও কে? ও কেন এমন করছে? ও কি চায়? ওর এসব কথার কোনই উত্তর না দিয়ে রাক্ষুসী মা বললেন, না মরলে বোধ হয় আর এই দুঃখ হতাশার হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেইরে শন্তু। আমাদের বড় দুঃখ রে।'

ওই লোকটা তোমার কে হয়, কেন বলছনা? ও-ই কি সেই জামাই', রাজা, আর তুমি সেই রাজকন্যা? মুখ তুলে ভাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল প্রশান্ত। এমন ভাবে ও রাক্ষুসী মার পথ আগলে দাঁড়াল, যেন উনি উত্তর দিতে বাধ্য হন।

স্পষ্ট এই প্রশ্ন শুনে রাক্ষুসী মাও মুখ তুলে তাকালেন। প্রশান্ত দেখল ওঁর দুচোখে সে কি ভীষণ অসহায় হতাশার ছবি আঁকা, যেন সব কিছু জানা সত্ত্বেও বলতে না পারার ব্যথায় ভরা চাহনি। কিন্তু কেন তিনি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন না। কেন বলতে পারছেন না এই বাড়িটা ঘিরে এ কি রহস্য জমাট বেধে আছে। আদিত্যের কথাই যদি বলতে পারলেন তো বাকী সব কিছু বলতে বাধা কোথায়? কে ওরা দুজনে? সব দিক ভাবলে তো এঁদেরই সেই রাজ কন্যা আর জামাই রাজা বলে মনে হয়। তবে তা বলতে বাধা কিসের? আর ওকেই বা কেন এখানে এমন করে বন্দী করে আনা হল? এরই বা কি মানে?

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করলেন রাক্ষুসী মা। ক' ধাপ উঠেই বললেন, 'আমি জানি শন্তু তোর মনের মধ্যে কি হচ্ছে? কিন্তু তুই তো জানিস না, আমাদের মনেও কি ভয়ঙ্কর ঝড় বইছে। আজ আমি তোকে স্পষ্ট করে কোন কথার জবাব দিতে পারছি না, জানিনা কোন দিনও পারব কিনা। তবে শুনে রাখ, তোর সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই আমরা এত সব কাণ্ড করছি। হ্যা রে শন্তু তোর সব কথার উত্তরই আমরা দিতে চাই। সব চেষ্টা আমাদের তার জন্য।'

'এসব বাজে হেয়ালী।' রাগ করে বলল প্রশান্ত, ওই লোকটা বলল, জেঠু আসবেন বিকালের ট্রেনে। তাঁকে আনতে গাড়ি গেছে স্টেশনে। এ কথার মানে তো একটাই, জেঠুকেও তোমরা যা হোক করে ধরে আনবে এখানে। তাও তোমরা করবে, আমার সব কথার উত্তর দেবার জন্য?

'ওরে শন্তু, বিশ্বাস কর বাবা, অমন কিছুই আমরা করব না।' বললেন রাক্ষুসীমা, আমাদের গাড়ি গেছে স্টেশনে, এলেই শুনবি তুই, কথা ঠিক। আজ উনি না এলে, কাল নিশ্চয়ই আসবেন। কাল না এলে তুই চিঠি দিস।'

(ক্রমশঃ)

বিদ্রোহী কবি নজরুল

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়



নজরুল যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন—শোনা যায় সেদিন বিকেলে ঈশান আকাশে উঠেছিল ভয়ংকর মেঘ। পরক্ষণেই শুরু হয়েছিল উথালি-পাথালি ঝড়। সঙ্গে বিদ্যুতের চমকানি আর মুশল ধারায় বৃষ্টি। প্রকৃতি দেবী যেন সেদিন বিদ্রোহের আবহাওয়া সৃষ্টি করে বলতে চেয়েছিলেন, শোনো বাঙলার মানুষ, মাতা জাহেদা খাতুনের কোল আলো করে আজ যে নব জাতকের জন্ম হলো, আগামী দিনে এই শিশুই হবে পরাধীন বাঙালী তথা ভারতবাসীর শৃঙ্খল মোচণের কর্ণধার। আসমুদ্র হিমাচলে এই শিশু পরিচিত হবে, 'বিদ্রোহ কবি' রূপে।

বর্ধমান জেলার আসনসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া (চুরুলিয়া গ্রাম অতীত কালে অস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্র ছিল) নামক একটি ছোট্ট গ্রামে বাঙলার ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে) মঙ্গলবার কাজী নজরুল ইস্‌লাম এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহ্‌মদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন।

নজরুলের ডাক নাম 'দুখু মিঞা'। এরকম নাম করণের কারণ হলো— নজরুলের ছিল তিন সহোদর ভাই ও উম্মে কুলসুম নামে এক ভগিনী, কিন্তু নজরুলের জন্মের আগে তাঁর তিন ভাই-'ই মারা যান, সেজন্য নজরুলের ডাক নাম রাখা হয় দুখু মিঞা। দুঃখের সংসারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেজন্যও এরকম নামকরণের তাৎপর্য আছে।

নজরুলের শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে। এমনও দিন গেছে তাঁর দু'বেলা খাবার জুটতো না। কতো দিন অনাহারে, ছেঁড়া জামাকাপড় পরে মকতবে (পাঠশালা) যেতে হয়েছে কিশোর নজরুলকে। এরই মাঝে তাঁর পিতা মারা গেলেন ১৩১৪ সালের (১৯০৮ খ্রীঃ) ৭ই চৈত্র। নজরুলের বয়স তখন মাত্র সাত বছর। পরিবারের মধ্যে তাঁর পিতাই ছিলেন একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর পর কাজী পরিবার চরম দারিদ্রের সম্মুখীন হল। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করা কঠিন হয়ে ওঠে। অগত্যা ক্ষুধার তাড়নায় রুটির দোকানে কাজ নিতে হয় বালক নজরুলকে।

নজরুল ছেলেবেলায় ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত ও চঞ্চল। তাঁর অত্যাচারে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। কোন শাসন নিষেধের বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না তিনি। আবার মাঝে মাঝে নজরুলের অদ্ভুত শান্ত শিষ্ট ভাব দেখে সকলে অবাক হয়ে যেতো। যেখানে কীর্তন হতো, কথকথা হতো, যাত্রাগান বা মৌলবীর কোরাণ পাঠ হতো দুরন্ত বালক দুখু মিঞার আচার ব্যবহারে অদ্ভুত ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে লোকে তাঁকে 'তারা খ্যাপা' বলে ডাকতো। কেউ কেউ বা আদর করে ডাকতো 'নজর আলি'।

দশ বছর বয়সে ১৩১৬ সালে (১৯০৯ খ্রীঃ) নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করেন। এরপর তিনি বর্ধমান জিলার মাথরুণ হাই স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এসময় (১৯১১ খ্রীঃ) নজরুল ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তেন। এরপর কিছুদিন তিনি ময়মনসিংহ জিলায় ত্রিশাল থানার অন্তর্গত দরিরামপুর হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভর্তি হলেন বর্ধমান জিলার রানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিয়াড়শোল রাজ স্কুলে। এসময় নজরুল অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন। তিনি ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলেন বলে তাঁর স্কুলের বেতন ও বোর্ডিং-এর খাওয়া খরচা লাগতো না। এছাড়া এসময় তিনি রাজবাড়ি থেকে

মাসিক সাত টাকা বৃত্তি পেতেন। এই রাজ স্কুলে নজরুল তিন বছর পড়াশুনো করেছিলেন। এবং এই স্কুলে পড়ার সময় শৈলজা নামে একটি হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব হয়েছিল— যে শৈলজা উত্তর কালে হয়েছিলেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

নজরুলের বয়স তখন ষোলো বছর। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন। সকলের প্রত্যাশা সে এ পরীক্ষায় নিশ্চয়ই বৃত্তি পাবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে নজরুল চলে গেলেন সৈন্যবাহিনীতে। ১৩২৪ সালের (১৯১৭ খ্রীঃ) নজরুল ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের সৈনিক হয়ে প্রথমে লাহোর ও নৌশেরাতে যান। সেখানে তিনমাস ট্রেনিং গ্রহণ করে তিনি বদলি হন করাচী সেনানিবাসে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে নজরুল ফিরে আসেন কলকাতায়। এরপর শুরু হয় তাঁর সাহিত্যিকের জীবন। তিনি মূলত কবি। তাঁর কবিতায় ঝরে পড়তো বিদ্রোহের আগুন। তাই লোকে তাঁকে বলতো বিদ্রোহী কবি। ১৯২২ খ্রীঃ'এর ২২শে সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দ-ময়ীর আগমনে' কবিতাটি লেখার জন্য নজরুলের এক বছর জেল হয়ে যায়। এসময় কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নামক নাটকটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন।

নজরুল শুধু বিদ্রোহী কবিই ছিলেন না, তিনি একধারে ছিলেন খুব ভালো গায়ক, সুরকার এবং এবং গীতিকার। এছাড়াও তিনি উপন্যাস, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধও লিখেছেন। ছোটদের জন্য লিখেছেন, 'ঝিঙে ফুল', 'সঞ্চয়ণ', পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে, 'ঘুম জাগানো পাখী', 'ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসি' প্রভৃতি বই গুলি। তাঁর 'ভোর হলো দোর খোলো, খোকা খুকু ওঠো রে' অথবা 'বাবুদের তালপুকুরে হাবুদের ডালকুকুরে' কবিতা কে না পড়েছে?

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মান সূচক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার '২১শে পদক' দিয়ে বিশেষ সম্মান জানান কবিকে।

তোমরা অনেকেই বোধহয় জানো, কবি দীর্ঘদিন 'পিকস ডিজিস' নামক একপ্রকার মস্তিষ্কের রোগে অসুস্থ ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রীঃ এর ২২শে জুলাই তারিখে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তাঁকে ঢাকার পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষভাবে খারাপের দিকে যায়। ১৯৭৬-এর ২৮শে আগষ্ট তার দেহের তাপমাত্রা ১০৩ ডিগ্রিতে পৌঁছায়। ২৯শে আগষ্ট দেহের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রিতে ওঠে। শাসকষ্ট বেড়ে যায়। ওই দিন বেলা ১০ টা ১০ মিনিটে (ভারতীয় সময় ৯ টা ৪০ মিঃ) কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

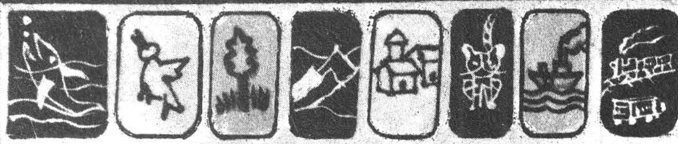
নানান দেশের নানান গল্প

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েট পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দশ টাকা। (পৃঃ ১০০)।

রূপকথা এবং লৌকিক গল্প সবদেশেই সব মানুষেরই, বিশেষ করে ছোটদের খুব ভাল লাগে। পৃথিবীর বড়, ছোট প্রায় সব দেশেই এই জাতীয় গল্প প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত, আর আশ্চর্যের বিষয় সেই সব গল্প ও কাহিণী আজও সকলে পড়ে আনন্দ পান। শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নানান দেশের নানান গল্প" বইটিতে পৃথিবীর ষোলটি বিভিন্ন দেশের ষোলটি এই জাতীয় গল্প আছে। একটি বইয়ে এতগুলি দেশের গল্প একসঙ্গে পাওয়ায় পাঠকমাত্রই খুসী হবে। সহজ, সরল, ঝরঝরে ভাষায় লেখা এই গল্পগুলিতে কত মজার মজার ঘটনা, কত চরিত্র—মানুষ, পরী, জন্তুজানোয়ার, পশুপাখী ইত্যাদি পাঠকদের মনে দাগ কাটে। ছোটদের ত বটেই, বড়রাও পড়তে ভাল লাগবে। গল্পগুলিতে একদিকে আনন্দের খোরাক আর অন্য দিকে শেখবারও বিষয় আছে। দেবাশীষ দেবের আঁকা তিন-রঙা প্রচ্ছদ এবং অন্যান ছবিগুলিও আকর্ষণীয়। বাড়ীতে পড়ার জন্য, পাঠাগারের জন্য, পুরস্কার হিসাবে অথবা জন্মদিন, উপনয়ন বা কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উপহার দেবার পক্ষে বইটি খুবই উপযুক্ত।

মঞ্জু মুখার্জী

কত অজানারে



পাখির দুনিয়া

স্নান

গ্রামের ছেলেমেয়েরা বলে শহরের লোকেরা নাকি কাকের মত স্নান করে। স্নানের সঙ্গে কাকের সম্পর্কটা কি এমন শুনি। আসলে শহরে পুকুর বলতে গেলে নেইই। গুণে বেছে লেকের সংখ্যাও খান দশেক। ট্যাপের মাপা জল। তা দিয়ে কোনো রকমে স্নান সারে শহরে অধিবাসীরা।

কাক তো পাখির দলে। দেখে থাকবে সামান্য জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে দাঁড়ায় কাক। একটুখানি জলের মধ্যেই মাথা গুঁজে ভেজায়, ডানা ঝাপটায়। তারপর উড়ে গিয়ে বসে ইলেকট্রিক পোস্টের মাথায় কিংবা কোনো উঁচু গাছে।

কাকের স্নানের সঙ্গে তাই অনেকেই শহরের লোকের স্নানের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পায়।

আমাদের মত পাখিরাও স্নান করতে ভালবাসে, স্নান করা মানে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। পাখিরা স্নান করে, সুতরাং ধরে নিতে হবে তারা অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে না।

যাদের বাড়ীতে পোষা মুরগী আছে তারা লক্ষ্য করে দেখো একসময় মুরগীরা পালকে ধুলো মাখে। তারপর গা ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ধূলোগুলো ঝটকা মেরে ঝেড়ে ফেলে। ফের ধূলো মাখে — ঝাড়ে। এভাবে বেশ কয়েকবার চলে তাদের ধূলো মাখা খেলা। এ খেলাটাও কিন্তু স্নান। একে বলা হয় ধূলো স্নান। পাখিরা অনেকেই ধূলো স্নান পছন্দ করে — সূর্য স্নানও।

আর জলে ডুব দিয়ে স্নান করলে একেবারে সাফ হয়। কিন্তু সত্যি বল তো ভেজা পাখিদের দেখতে বিশ্রী লাগে কিনা।

স্নান করে উঠে ওরা পালক ঝেড়ে জলগুলো নিংরে নেয়, পালক ঝরঝরে হলে ঠোঁট দিয়ে পাঠ পাট করে সেগুলো সাজায়। সাজানো শেষ। এবার লেজের কাছে থাকা থলি থেকে তেল বের করে সারা অঙ্গে মাখে। তারপর? বন্ধুদের সঙ্গে গলা উঁচু করে গল্প জুড়ে দেয়।

পাখির গান

শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকৃতির যে মধুরতম শব্দ শুনে আমরা আনন্দিত হই সেটি হল পাখির কল-কাকলি। যা অনেক পাখির কন্ঠে দীর্ঘ সুর সমন্বিত গানের রূপ গ্রহণ করে।

অন্যান্য প্রাণীর মত পাখিরাও দলবদ্ধভাবে পরিজনদের মধ্যে বাস করতে ভালবাসে। অন্য প্রাণীর মত তারাও মনের ভাব প্রকাশ করে। আমরা যেমন একে অপরের সঙ্গে শব্দের মাধ্যমে কথা বলি, পাখিও বলে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে পাখির ভাষা ও শব্দের পার্থক্য রয়েছে।

পাখিরা শব্দ করে কথা বলে, মনের ইচ্ছে জানায়, একে অপরকে খোঁজে, বিপদের সম্ভাবনা জানায় এবং লুকিয়ে বা দূরে থাকা সঙ্গীকে অবস্থান বলে দেয়।

মানুষ কথা বলার জন্য মানুষের ওপর নির্ভরশীল। নবজাতক মা বাবা বা অন্য আত্মীয়দের কথা শুনে কথা বলতে শেখে এবং ভাষা জানে। কিন্তু পাখিরা নয়। পাখি বিশেষজ্ঞরা সদ্য ফোটা পাখির ছানাকে অন্যত্র সরিয়ে রেখে দেখছেন শাবক নিজেই শব্দ করেছে। গেয়েছে গান, অথচ বিশেষজ্ঞরা কড়া ব্যবস্থা রেখেছিলেন যাতে পাখিটি অন্য পাখির কণ্ঠস্বর না শোনে।

তাঁরা আরো দেখেছেন যে, এক পাখি অন্য পাখির ভাষা শেখে না। কেবল নিজের জাতের ভাষা সে বলে। আবার এও প্রমাণিত হয়েছে, ইচ্ছে করলেই তারা অন্য জাতের পাখির গান ও ভাষা

৪৪ পাতায় শেষাংশ

মজার খবর

বরুণ মজুমদার

সৌভাগ্যের স্বপ্ন

আমরা যাকে সংস্কার বলি, সেই সংস্কারও মাঝে মাঝে মানুষের ভাগ্য সত্যিই ফিরিয়ে দিতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার তাজোঁতে এক ফল বিক্রেতা শূয়োরের স্বপ্ন দেখে ওলিম্পিক লটারীর প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কারের অর্থ হিসেবে তিনি পাচ্ছেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭১৯ মার্কিন ডলার।

ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক ঐ ফল বিক্রেতা কিম চুন-বক দক্ষিণ চুংচুং প্রদেশের রাজধানীর রাস্তায় ফল বিক্রী করতেন। গত ১৫ই এপ্রিল রাত্রে ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে ঐ প্রদেশের শহরে তার পুরানো বাড়ীতে একটা বিরাট শূয়োর প্রবেশ করল। তিনি তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তিনি খবর পেলেন যে, পয়লা এপ্রিল চালু করা প্রথম ওলিম্পিক লটারীর পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ১৯৮৮ সালের সিউল ওলিম্পিকের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐ লটারী চালু করা হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে কোরিয়ানরা মনে করেন যে, শূয়োরের স্বপ্ন দেখাটা হল সৌভাগ্যের প্রতীক। বিশেষ করে শূয়োরের স্বপ্ন দেখলে প্রচুর অর্থ লাভ হয়।

০ ০ ০

বিয়ে করে বিপত্তি

দক্ষিণ বাংলা দেশের চট্টগ্রাম শহরের কাছে ফতেহাবাদ গ্রামে গত ২২শে এপ্রিল ১০৪ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ইমাম এক ষোড়শী অনাথা যুবতী মরিয়াম বেগমকে তার পঞ্চম স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই নিকে হয়ে যাবার পর গ্রামবাসীরা চটে আগুন। তাদের দাবী ঐ বৃদ্ধ আলি আজমকে ইমামের পদ থেকে বহিষ্কার করা হোক। কেননা তাদের মতে ঐ ইমাম সাহেব চারটির বেশী বিয়ে করে ইসলামিক আইন ভঙ্গ করেছেন। ইসলামিক আইনে সর্বাধিক চারটি বিয়ে অর্থাৎ নিকে করার বিধান আছে। ইমাম অবশ্য সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, ঐ যুবতীকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি তাকে সাদী করেছেন।

নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি

লিউকোমিয়া বা ব্ল্যাক ক্যানসারের রোগীদের পক্ষে একটা সুখবর আছে। বোম্বাই-এর টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের একদল চিকিৎসক ন' বছর বয়স্ক একটা মেয়ের অস্থিমজ্জা রূপান্তর অস্ত্রোপচার করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। দেশে এ ধরণের অস্ত্রোপচার এই প্রথম। এর সাফল্য চিকিৎসক মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এতে শুধুমাত্র ব্ল্যাক ক্যান্সারই নয়, অন্যান্য রোগ, বিশেষ করে শিশুদের রোগের চিকিৎসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। অস্থি—মজ্জা রূপান্তরের লক্ষ্য ওষুধের মাধ্যমে ও রশ্মির মাধ্যমে চিকিৎসা করে রোগীর ক্যান্সারগ্রস্ত রক্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া। তারপর উপযুক্ত দাতার অস্থিমজ্জার কোষ নিয়ে তা রোগীর দেহে সংযোজন করলে রোগ সেরে যায়।

মাছ খান, সুস্থ থাকুন

আপনি মাছ খান এবং শরীর ও চোখ মজবুত রাখুন। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের কাভারথীতে সপ্তাহ ব্যাপী একটি চক্ষু শিবিরে একজন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক সমীক্ষা চালিয়ে একথা জানিয়েছেন। কোচিন সরকারী হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাঃ কে পি ম্যাথু বলেছেন যে ঐ দ্বীপপুঞ্জের বসবাসকারী একজনকেও তিনি পুষ্টিহীনতায় ভুগতে দেখেননি। কারণ তারা প্রচুর পরিমাণে মাছ খান। এই মাছে ভিটামিন সমৃদ্ধ। তারা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখেন এবং অতিরিক্ত ভীড় এড়িয়ে চলেন, তাই তাদের মধ্যে চোখের ট্রাকোমা রোগের অস্তিত্ব নেই।

৪২ পাতার পর

বিয়ে বাড়ীর ভোজ

দৈনিক সংবাদপত্রে নানা ধরনের বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। এমন কি নব দম্পতির ছবি ছেপে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া বাড়ীতে যাদের ইতিমধ্যে বিয়ে হয়েছে তাদের সকলকে ঐ বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু ঐ বাড়ীর মালিক বিজ্ঞাপন মারফত ঐ বাড়ীতে বিয়ে হওয়া সব দম্পতিকে গত পয়লা বৈশাখ নব বর্ষের দিন নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে এক শর্ত অবশ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। শর্তটা এই যে, ঐ বাড়ীতে যে তাদের বিয়ে হয়েছে তার প্রমাণ–স্বরূপ আগেকার ছাপা বিয়ের কার্ড সঙ্গে আনতে হবে।

ল্যান্সডাউন রোডের একটা বাজারের কাছে ঐ বাড়ীতে বাঙালী, মারাঠি, গুজরাটী সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক বিয়ে হয়েছে। বলা বাহুল্য ঐ বিজ্ঞাপন দেখে প্রায় দেড়শো দম্পতি সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। তাদের জীবনের অতীতের মধুর দিনগুলোর কথাও হয়ত আবার মনে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ ব্যবস্থা

মাকিন যুক্তরাস্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ২৫ জন নাবিক ও পাইলটকে রুশ আন্তর্জাতিক পরীক্ষামূলক মহাকাশ ব্যবস্থায় বিপদমুক্ত করা হয়েছে। নানা জায়গায় নানা দুরাবস্থায়, গত আট মাসের মধ্যে এই ২৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'কোম্পাস্ সার্সাৎ'। এর কাজ হলো বিপদাপন্ন জাহাজ ও বিমানের সন্ধান বের করা। একটি কৃত্রিম উপগ্রহ এই সব বিপদাপন্ন জাহাজ বা বিমানের সংকেত ধরে এবং তা আবার জানিয়ে দেয়। তারপর সেখানে উদ্ধারের ব্যবস্থা পাঠানো হয়।

গত বছর ভিয়েনা থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে ভেঙে পড়া এক ছোট বিমানের আহত পাইলটকে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বাঁচানো হয়েছে বলে, ফ্রান্সের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে জানানো হয়েছে। (P T I)

শিখে নেয় স্বচ্ছন্দে, অন্য পাখির স্বর হুবহু নকল করাও এদের বৈশিষ্ট্য।

আশ্চর্যের বিষয়, প্রানী বিজ্ঞানীরা সমীক্ষায় প্রত্যক্ষ করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একই জাতের পাখি বিভিন্ন স্বর ও ভাষা ব্যবহারে লিপ্ত।

নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন

পথ চিনে বাসায় ফিরে আসে পাখি। নিজের এলাকার বাইরে বহুদূর থেকেও কি করে পাখিরা পুরনো আবাসে ফেরে? প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের কাছে বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। বহু চেষ্টা করেও রহস্য উদ্ধার হয়নি। ঠিক কোন্ পথ নির্দেশিকার সহায়তায় তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় জানা যায়নি।

পরীক্ষার জন্য ৭টি স্যালো পাখিকে তার নীড় থেকে ৪০০ মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। মুক্ত অবস্থায় প্রথমে গাছের ডালে বসে তার পর তাদের পাঁচটি ফিরে আসে পুরনো বাসায়। অর্থাৎ যেখান থেকে পাখিগুলিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল।

অপর একটি পরীক্ষায় কিছু সামুদ্রিক পাখিকে বিমানে করে অন্যত্র নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পর দেখা গেল সেই সামুদ্রিক পাখিরা নিজেদের এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেছে। যদি সোজা পথে তারা ফিরে থাকে তাহলে তারা অতিক্রম করেছে ৯৩০ মাইল। এই দীর্ঘ অপরিচিত পথ চিনে পাখিরা কি করে ফিরে এল।

পরিব্রাজক পাখিরা ঘরে ফেরার ব্যাপারে আরো বেশী দক্ষ। ইংল্যাণ্ড থেকে প্রতি বছর স্যালো পাখিরা উড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। বসন্তের প্রত্যাগমনে তারা ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসে। কিন্তু ওই পাখিদের মধ্যে কিছু কিছু স্যালো এক বছর আগে যে বাসায় বাস করত ঠিক সেই বাসাতেই ফেরে। বাসায় ফিরতে তারা অতিক্রম করে ৬০০০ মাইল আকাশ পথ।

যাযাবর পাখিরা সমুদ্রের বিশাল বক্ষের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়। আবার ফিরে আসে পরিত্যক্ত কুলায়। সমুদ্র বা শূন্য পথে কি বস্তু পাখিদের—পথ চিনিয়ে দেয়? কিংবা উড়ে যাবার সময় কিভাবে তারা দিক নির্ণয় করে? এই প্রশ্নের সমাধান আজো হয়নি। সুতরাং দূর দূরান্তরে প্রত্যা-বর্তন রহস্য প্রকৃতির অন্যতম বিস্ময়। ক্রমশ:



ছোটদের আসর প্রসঙ্গ

ছোটদের আসরের আমি নিত্য পাঠ করি। পত্রিকাটির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যতা আমার দারুণ পরিতৃপ্তি দান করে। ছোটদের পত্রিকাটি তো প্রিয়ই, আমাদেরও ভীষণ প্রিয়। কামনা করি পত্রিকাটির বহুল প্রচার ও প্রসার।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
৩, বেনেপাড়া লেন,
কলিকাতা-৭০০০১৪

উঃ সকলের ভাল লাগাটাই আমাদের অর্থাৎ ছোটদের আসরের সাফল্য।

আসরের চিঠিপত্র

প্রতিভা প্রতিযোগিতা

বহুল প্রচারিত পত্রিকায় দেখলাম যে আপনারা যে কোনো বয়সেরই হোক না কেন কিশোর মনের উপযুক্ত লেখা নিতে ইচ্ছুক। আরো অবগত হলাম যে ১,৫০০ শব্দের মধ্যে ছোট গল্প লিখে পাঠাতে হবে।

তবে, এ ব্যাপারে আমার কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে।

প্রথম। এই ছোটগল্প একটি পাঠালে হবে না আরো পাঠাতে হবে ?

দ্বিতীয়। কিভাবে আমি বুঝব যে আমার লেখা সিলেক্ট হল।

তৃতীয়। এই লেখার জন্যে কোনো ফী পাঠাতে হবে কিনা।

তাপস ব্যানার্জী
রাম মন্দির, চুঁচুড়া, হগলী।

উঃ প্রথম। একাধিক গল্প পাঠাতে পারেন।

দ্বিতীয়। লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হলে শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। প্রশংসা পত্রের যোগ্য হলে চিঠি দিয়ে জানানো হবে।

তৃতীয়। না, এই লেখার জন্য কোনো ফী দিতে হবে না।

অভিনন্দন

নববর্ষের শুরুতেই 'ছোটদের আসর' হাতে পেয়ে খুব খুশী হলাম। পরবর্তী সংখ্যা থেকে 'মাসিক ছড়া' প্রতিযোগিতা শুরু করুন। ছোটদের আসরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিপ্লব, অভিজিৎ, আশীর্বাদ ও রণধীর নাথ, নীলকন্ঠপুর, কান্দি।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৯০

কবিগুরুর উদ্দেশে শুভেন্দু কুমার ভৌমিক-এর লেখা 'প্রণাম ২৫শে বৈশাখ' ছোটদের আসর থেকে সংগ্রহ করে মাস্টার সুধীরচন্দ্র দাসের প্রেরণায় ভাই বকুল বোন কুন্তলা সব পেয়েছির আসর মণিমেলা রবীন্দ্র জয়ন্তীর শুভারম্ভে আবৃত্তি করে। এই অনুষ্ঠান দর্শকবৃন্দের মনোমত ও প্রশংসা অর্জনে সাফল্য পায়। তাই আমরা ছোট ছেলেমেয়েরা লেখক বন্ধুকে অভিনন্দন পত্র পাঠাতে এবং আমন্ত্রণ করতে উৎসাহী। নিবেদন, ওনার ছবিসহ ঠিকানা ছেপে দেবেন কি ?

বিনীত—

তপন, সুকোমল, মণীন্দ্র, অনিমেষ, বুলা, চৈতালী, দিপালী, রেবা, রত্না এবং আরো অনেকের পক্ষে দিদিমণি চিত্রিতা মজুমদার, দমদম, কলিকাতা–৫০।

আসরের চিঠিপত্রে তোমাদের অভিনন্দন পত্রটি প্রকাশিত হল। লেখক শুভেন্দু নিশ্চয়ই পড়ে উৎসাহিত হবে।

না ভাই, কোনো একজন লেখকের ছবি আর ঠিকানা দেওয়া সম্ভব নয়।

ছড়া প্রতিযোগিতা

ছোটদের আসরে গল্প প্রতিযোগিতার বদলে যদি দু–একটি সংখ্যায় ছড়া প্রতিযোগিতা থাকে তবে খুব ভাল হয়। এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় দপ্তরের মতামত জানতে চাই।

অরুণাভ নাথ (মুর্শিদাবাদ), শ্যামল ব্যানার্জী (শিলিগুড়ি), কমল ধর কলিকাতা-৭৩ এবং আরো অনেকে।

উত্তর ঃ তোমাদের মতামত আমাদেরও খুব ভাল লাগল এবং খুব তাড়াতাড়ি ছড়া প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেখতে পাবে। কেমন খুশী তো ?

পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো হোক্

ছোটদের আসর কিশোর মনোরঞ্জক মাসিক পত্রিকা। আমার বিনীত অনুরোধ এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো হোক্।

দেবাশীষ দেব,
কাঁচরাপাড়া।

উত্তর ঃ এই মুহূর্তে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়।

'ছোটদের আসর ভাল'

গত কয়েকটি সংখ্যা ছোটদের আসর পড়লাম। সত্যি দারুণ পত্রিকা। কিন্তু এক মাস অপেক্ষা করা অনেকটা কষ্টকর। পাক্ষিক করা যায় না।

সজল বর্মণ, ত্রিপুরা।

উত্তর ঃ ভবিষ্যতে চেষ্টা করা যাবে।

ইঁদুর কল

মৃণালকান্তি দাশ

"ইঁদুর ধরা কল আছে কি
দিন না তাড়াতাড়ি—
সামতাবেড়ে লোক্যাল ধরে
ফিরতে হবে বাড়ি।"

"কল আছে ভাই হরেক রকম
সস্তা এবং দামি,
কোনটা আবার আদ্যিকালের,
কোনটা বা খুব নামী।

সব কলে যায় ইঁদুর ধরা,
বাচ্চা এবং ধেড়ে—
ভুলেও বাপু যায় না ধরা
লোক্যাল সামতাবেড়ে।"

লাকি নাম্বার ফলাফল

বিশিষ্ঠ সাহিত্যিক, ছোটদের আসরের কর্মীবৃন্দ এবং আলোক চিত্রশিল্পী ও লেখক শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে লাকি নাম্বার নির্বাচন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

নির্বাচির্ত নম্বর **1737**

যার কুপনের সঙ্গে এই নম্বরটি মিলে যাবে সে কুপনটি পূর্ণ করে দপ্তরে এসে উপহার নিয়ে যাবে। দূরবর্তী প্রাপকদের জানানো হচ্ছে তার কুপন পূর্ণ করে ডাকে পাঠালে উপহার ডাকযোগে পাঠানো হবে।

এই প্রতিযোগিতা বন্ধ ঘোষনা না করা অবধি চলতে থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে
—সম্পাদক

ফুটবলের বিধিনিষেধ

॥ ফুটবল ॥

বিশেষজ্ঞদের ধারণা পৃথিবীর আদিম মানবই ফুটবলের জন্ম দাতা।

বিশেষতঃ প্রথম মানব আদম একটি আপেলে লাথি মারাতেই নাকি ফুটবল খেলার জন্ম হয়।

আবার এই ফুটবলই নাকি হিংস্র আদিম মানবের কাছে ছিল এক অমানবিক উল্লাস সামগ্রী। তাদের ফুটবল নরমুণ্ড। পরাজিত শত্রুর মাথা নিয়ে নাকি তারা লাথালাথি করত। আদমের আপেল ও আদিম হিংস্রতা থেকে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে আজ ফুটবল এক নির্মল ক্রীড়া মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বিদেশে কোথাও এর অপর নাম সকার। ভারতে ফুটবলের স্বাদ এনে দিয়েছে ব্রিটিশ ও তাদের রাজত্ব কাল। বিশ্বের দরবারে সর্বোচ্চ আসন না পেলেও ভারতে ফুটবল জনপ্রিয়। ভারতের ফুটবলের সিংহ ভাগ জুড়ে আছে পশ্চিম বাংলা ও তার নয়ন মনি কোলকাতা।

ফুটবলার হওয়া যায় কি করে ??

তোমাকে একটা বল দিয়ে বলা হল কিক্ মারতে। সে বলে লাথি মারল ঠিকই। কিন্তু বলটা কোন্ দিকে পাঠাবে সেটা আগে ঠিক করে নাওনি। তাই সেটা এলোমেলো ভাবে একদিকে চলে গেল। অর্থাৎ তুমি লক্ষ্যহীন।

এভাবে এলোমেলো 'লাথি' মেরে ফুটবল খেলা হয় না। তাই, আবার বলটা তোমার সামনে দেয়া হল। কিক্ মেরে বলটা কোথায় পাঠাবে মনে মনে ভেবে এবার ঠিক করে নিলে, একটু সময় বেশী লাগল বটে। কিকিংয়ের পর বলটা যেখানে পাঠাতে চেয়ে ছিলে সেখানে না পৌঁছলেও সেই দিকে গেল। অর্থাৎ বুদ্ধি–বিবেচনা আর সিদ্ধান্ত লক্ষ্য এক করে কিক নেয়া ফুটবল প্লেয়ারের সব চেয়ে বড় কাজ।

অনুমান করা যাক একজন প্লেয়ার বল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেখল প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ তাকে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে আসছে। এই অবস্থায় তার চেষ্টা আক্রমনাত্মক শট নিতে। মুহূর্তের মধ্যে সে দেখল বল তার আওতায় নেই, চলে গেছে অপর দলের খেলোয়াড়ের পায়ের চেটোয়।

ইতিমধ্যে তার সতীর্থ খেলোয়াড়রা কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। যে তাদের কাছে বলটি পাশ দিতে পারত। পাস দিলে অপর পক্ষের পায়ে বল যেতনা। অতএব, দেখা যাচ্ছে ফুটবল একক এবং একার খেলা নয়।

যদিও, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সময় একক দক্ষতা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ফুটবলে রয়েছে। তবু, এ–খেলা দলীয়। দলীয় শক্তি সামর্থ্যই যে কোন ফুটবলদলের সাফল্যের গোপন অস্ত্র। আবার পরা–জয়ের মূল কারণও।

ফুটবলটীমের অন্যতম খেলোয়াড় হতে হলে চাই বডি ফিটনেস, মনোবল, নির্ভীকতা।

চাই ক্লীনলিনেস। বলকে আয়ত্তে আনা, সতীর্থ খেলোয়াড়ের পায়ে পৌঁছে দেয়া, বিপদ মুক্ত করা, আক্রমনে সহযোগিতা করা প্রতিটি পদক্ষেপে সফল হবেই এই আত্ম-প্রত্যয় পায়ের কাজে ফুটে ওঠা চাই।

স্পোর্টস্‌ম্যান শিপ বা খেলোয়াড়চিত মনোভাব। খেলায় জেতার জন্য অবশ্যই আক্রমনাত্মক রীতি অনুসরণ করতে হবে, জয়ে হতে হবে উচ্ছ্বসিত। অথবা পরাজয়ও হতে পারে।

জয় বা পরাজয়ে কোন অবস্থাতেই ফুটবলের নীতি বিরুদ্ধ এমন কোন স্বভাবের পরিচয় দিতে নেই যাতে রেফারী স্পোর্টস্‌ম্যান শিপের অভাব লক্ষ্য করেন।

দক্ষ খেলোয়াড় হতে হলে চাই বলের ওপর অদ্ভুত দখল। দখল শরীরের ভারসাম্য রক্ষাতেও।

ছোটদের আসর ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতার বিষয়—গ্রীষ্মের ছুটী

অনূর্ধ পনেরো বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। প্রতি মাসেই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গল্প অবশ্য মৌলিক হওয়া চাই। ফুলস্কেপের এক পৃষ্ঠায় আড়াই শ' শব্দের মধ্যে গল্পটি লিখতে হবে। গল্প প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্য পৌঁছানো চাই। এবং ডাকযোগে পাঠাতে হবে। কোন সময়ে তা হাতে হাতে গ্রহণ করা হবে না। খামের ওপর ছোটদের আসর ছোট গল্প প্রতিযোগিতা কথাটি লিখতে হবে। বিচারকমণ্ডলীর রায়ই চূড়ান্ত। সেরা দুটি লেখার জন্য একটি করে খেলার বই পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কৃত গল্প ছোটদের আসরে প্রকাশিত হবে। নিম্নের কুপনটি পূরণ করে গল্পের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে।

প্রতিযোগিতার কুপন

নাম

বয়স

অভিভাবকের নাম

ঠিকানা

লাকি নাম্বার জিতে নাও— 294

পাঠক বন্ধুরা,

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার এই কুপনটি যত্ন করে রাখো। এখানে যে নম্বর আছে সেটা নিয়ে একটা লাকি নাম্বার প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশ হবে আগামী সংখ্যায়। তোমার নম্বরটি যদি মিলে যায় তাহলে কুপন পূরণ করে পাঠাও।

লাকি কুপন

পুরস্কার—দশ টাকা মূল্যের একটি বই

নাম 294

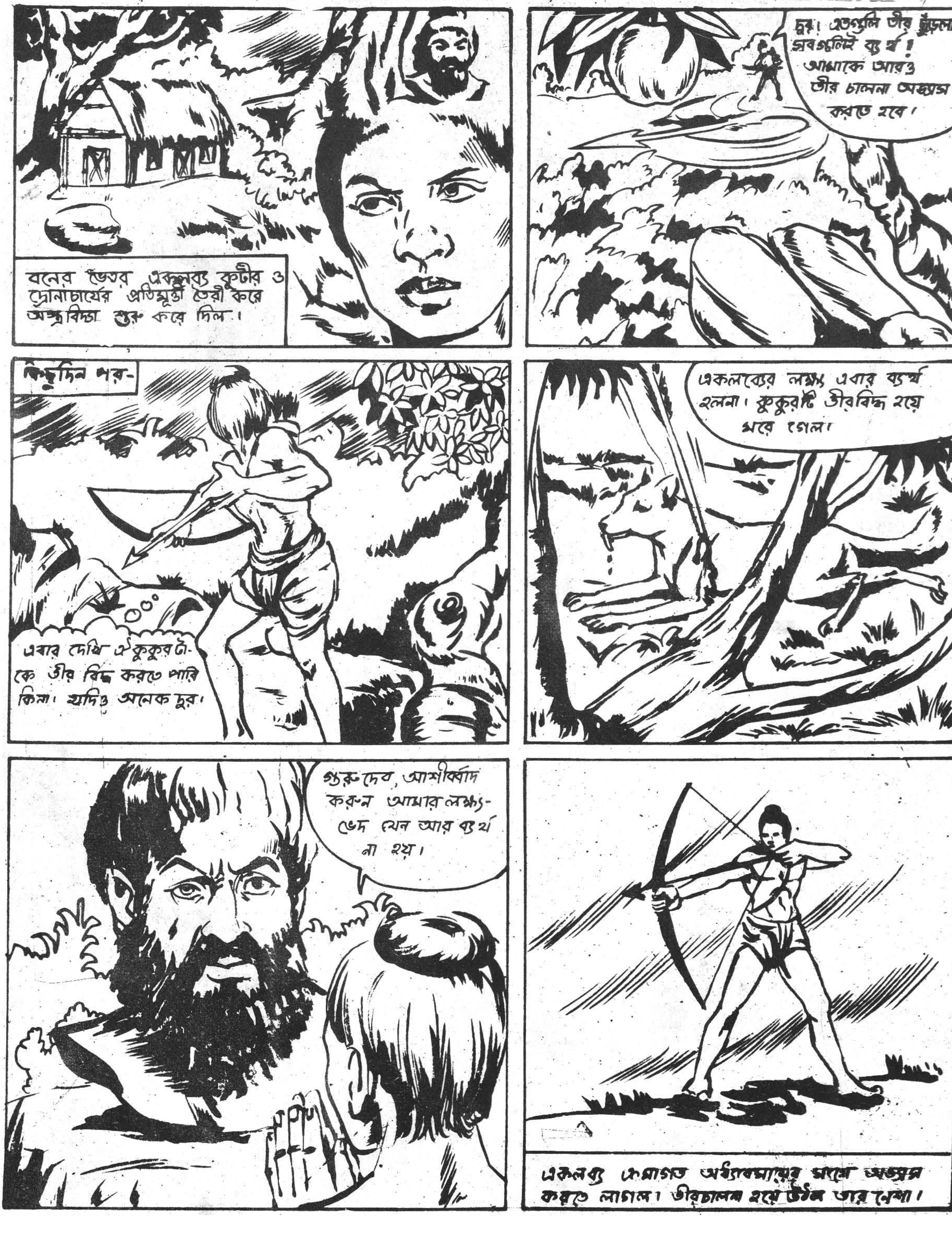
বয়স

অভিভাবকের নাম

ঠিকানা

একলব্য

চিত্র ও চিত্রনাট্য — শ্রীবিদ্যা অশোক



Regd. No. 34364 CHHOTODER ASAR MAY-JUNE '83 Price Rs. 2·00 only

